কৃষ্ণার
পরিচয়

কুন্ডু ব্যাক্তিগত পাঠাগার

www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

আমার কথা

বাংলা বইয়ের স্বর্ণখনি আমার সংগ্রহে আছে। যে বইগুলো আমার পছন্দ এবং ইতিমধ্যে ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো নতুন করে স্ক্যান না করে পুরনোগুলো বা এডিট করে নতুন ভাবে দেবো। যেগুলো পাওয়া যাবেনা, সেগুলো স্ক্যান করে উপহার দেবো। আমার উদ্দ্যেশ্য ব্যবসায়িক নয়। শুধুই বৃহত্তর পাঠকের কাছে বই পড়ার অভ্যেস ধরে রাখা। আমার অগ্রণী বইয়ের সাইট সৃষ্টিকর্তাদের অগ্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাদের বই আমি শেয়ার করব। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বন্ধু অস্টিমাস প্রাইম ও পি. ব্যান্ডস কে - যারা আমাকে এডিট করা নানা ভাবে শিখিয়েছেন। আমাদের আর একটি প্রয়াস পুরোনো বিস্মৃত পত্রিকা নতুন ভাবে ফিরিয়ে আনা। আগ্রহীরা দেখতে পাবেন www.dhulokhela.blogspot.in সাইটটি।

আপনাদের কাছে যদি এমন কোনো বইয়ের কপি থাকে এবং তা শেয়ার করতে চান - যোগাযোগ করুন - *subhajit819@gmail.com*.

PDF বই কখনই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না। যদি এই বইটি আপনার ভালো লেগে থাকে, এবং বাজারে হার্ড কপি পাওয়া যায় - তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মূল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল। হার্ড কপি হাতে নেওয়ার মজা, সুবিধে আমরা মানি। PDF করার উদ্দেশ্য বিরল যে কোন বই সংরক্ষণ এবং দূর দূরান্তের সকল পাঠকের কাছে পৌছে দেওয়া। মূল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকদের উৎসাহিত করুন।

There is no wealth like knowledge, **No poverty like ignorance**

হার্ডকপি ও স্ক্যান ঃ মাধব রায়

SUBHAJIT KUNDU

৪ কুয়াশার পরিচয়

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

কৃষ্ণা-সিরিজের ৪নং গ্রন্থ

কৃষ্ণার পরিচয়

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

দেব সাহিত্য কুটীর

কলিকাতা

KRISHNAR PARICHAY
CODE NO. 4-45-010

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা-৯

মে
১৯৮৫
৪

ছেপেছেন—
বি· সি· মজুমদার
বি· পি· এম'স প্রিন্টিং প্রেস
রঘুনাথপুর, দেশবন্ধুনগর
২৪ পরগণা (উত্তর)

দাম—
টা. ৬·০০·

উপহার

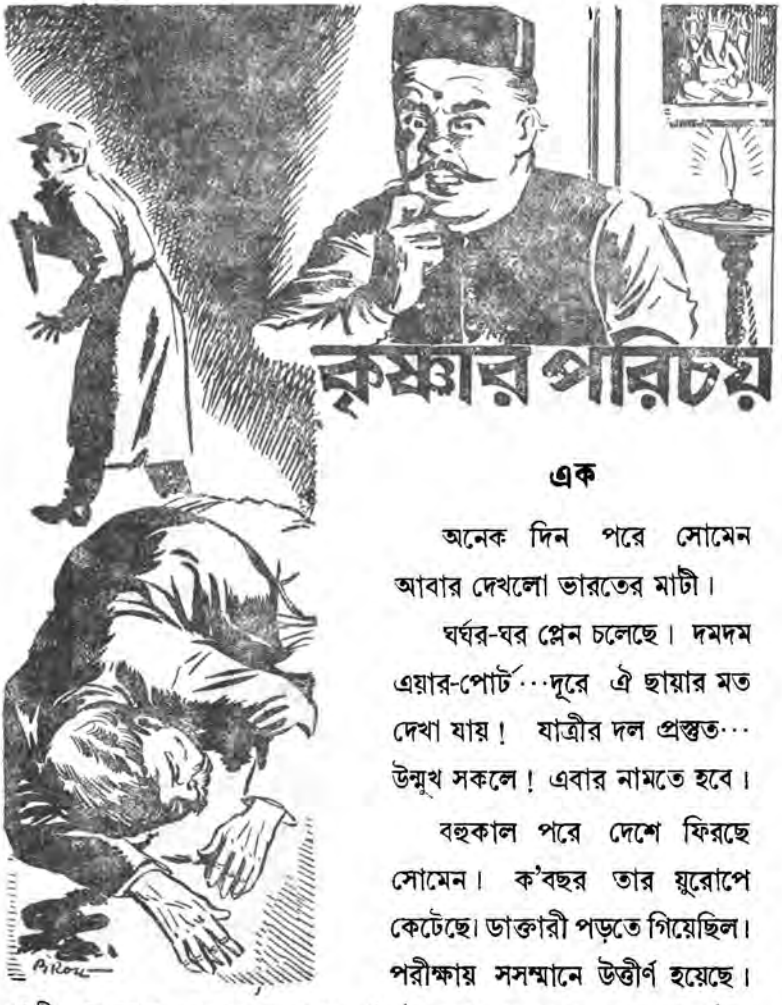

কৃষ্ণার পরিচয়

এক

অনেক দিন পরে সোমেন আবার দেখলো ভারতের মাটী।

ঘর্ঘর-ঘর প্লেন চলেছে। দমদম এয়ার-পোর্ট···দূরে ঐ ছায়ার মত দেখা যায়! যাত্রীর দল প্রস্তুত··· উন্মুখ সকলে! এবার নামতে হবে।

বহুকাল পরে দেশে ফিরছে সোমেন। ক'বছর তার য়ুরোপে কেটেছে। ডাক্তারী পড়তে গিয়েছিল। পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে। বাড়ী ফেরবার পথে য়ুরোপের পাঁচটা জায়গা দেখে আসবে ঠিক

করেছিল! মামাকে সে কথা জানাতে মামা তাকে টাকাও পাঠিয়েছেন। হঠাৎ সুইজার্লাণ্ডে সে মায়ের কেব্‌ল্ পেলো—কেব্‌ল্ পাবামাত্র সে যেন চলে আসে—জরুরী প্রয়োজন!

নিশ্চয় কোনো বিপদ!

মা বিপদের উল্লেখ করেন নি—তবু সোমেন যেন বুঝতে পেরেছে! মামাই বরাবর চিঠি দেন, টাকা পাঠান, কেব্‌ল্ করেন,—মায়ের কেব্‌ল্‌খানা তাই তাকে বেশ বিচলিত করে তুলেছে!

প্লেনের টিকিট কিনতে গিয়ে দেখে, সাত দিনের মধ্যে সীট মিলবে না! সব বুক্ হয়ে গেছে! শুনে সে অস্থির হয়ে ওঠে।

ফিরে আসবার সময় অকস্মাৎ দেখা হয়ে গেল রঘুনাথ তেওয়ারীর সঙ্গে। কি কাজে তিনি এরোপ্লেন কোম্পানির অফিসে এসেছিলেন। শুষ্ক-মুখ সোমেনকে দেখে তিনি প্রশ্ন করে ব্যাপার জানলেন। একটু হেসে সোমেনের পিঠ চাপড়ে বললেন, "তার জন্য মুষড়ে পড়বার কারণ নেই সোমা! আমার নিজের প্লেন আছে কাল বেলা দশটায় আমি ভারতে রওনা হবো, কথা আছে। আমি তোমায় সঙ্গে করে বাংলায় পৌঁছে দেবো···মাই ওয়ার্ড!"

সোমেন যেন আকাশের চাঁদ পেলো হাতে। কতখানি সে কৃতজ্ঞতা জানালো অন্তরের আবেগ!

রঘুনাথ তেওয়ারী মামার বিশিষ্ট বন্ধু। সোমেনের মামা আশু চৌধুরীর কাছে প্রায় আসেন এবং আশুবাবুও রঘুনাথের কাছে যান। সোমেন জানে, মামার হাতে টাকা-কড়ি না থাকলে রঘুনাথ তাঁকে টাকা দিতেন! সোমেন জানতো, সোমেনকে বিলাতে পাঠাবার সময়েও আশুবাবু রঘুনাথের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলেন।

রঘুনাথ তেওয়ারী নামজাদা ব্যবসায়ী। সারা ভারতে নয় শুধু, তাঁর কারবার দেশ-বিদেশের সঙ্গে! এজন্য দরকার হলে তাঁকে দেশ-বিদেশে যাতায়াত করতে হয়। এমনি ব্যবসার ব্যাপারে লণ্ডনে এসেছিলেন, কাজ মিটে গেছে—এখন দেশে ফিরছেন।

রঘুনাথের প্রাইভেট সেক্রেটারি শঙ্করলাল—তাঁরই দেশালী। ছেলেটিকে ছোটবেলা থেকে তিনি মানুষ করেছেন, তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন। শঙ্করলাল বাংলা ভাষা জানে, বাংলা বলতে পারে চমৎকার!

রাত্রিটা কোনোরকমে কাটিয়ে সকালেই সোমেন তেওয়ারীর ইণ্ডিয়ান টোবাকো হাউসে হাজির হলো।

প্লেনে পাঁচজন যাত্রী—রঘুনাথ, শঙ্করলাল, রঘুনাথের দু'জন কর্ম্মচারী এবং পঞ্চম ব্যক্তি সোমেন।

সোমেনের মন উদ্বেগে আকুল! প্লেনে প্রায় চুপচাপ—কথাবার্ত্তা নেই! নিঃশব্দে নির্দ্দিষ্ট সীটে বসে একখানা বইয়ের পাতা উল্‌টে চলেছে।

রঘুনাথ প্লেনে বসেই ঝিমোতে সুরু করলেন। কর্ম্মচারী দু'জন নিম্নস্বরে পরস্পরে আলাপ-আলোচনা করছিল। শঙ্করলাল সোমেনের সঙ্গে আলাপ করতে এগিয়ে এলো, বললে, "পাঁচ বছর পরে বাড়ী ফিরছেন সোমেনবাবু, কিন্তু আপনাকে ভারী উৎকণ্ঠিত দেখছি! এর মানে? কোনো লভ্‌ এপিসোড্‌ নয় তো!"

কথাটা বলে শঙ্করলাল হাসলো। সে হাসি সোমেনের কদর্য্য লাগলো। বই বন্ধ করে শঙ্করলালের পানে সোমেন তাকালো। বললে, "মোটেই না শঙ্করবাবু। য়ুরোপের কিছুই আমায় চার্ম করতে পারেনি!

আমি য়ুরোপে গেছি অন্য কারণে—য়ুরোপ ছাড়ার জন্য আমার মন খারাপ নয়!"

সে আবার বইয়ের পাতা উল্‌টোয়।

শঙ্করলালের সঙ্গে তার বিশেষ পরিচয় নেই। সাধারণভাবে দেখলে লোকটিকে দাম্ভিক বলে মনে হয়। রঘুনাথ তেওয়ারীর আর যাই থাক —বিলাসিতা ছিল না! তাঁকে দেখে কেউ বুঝতে পারবে না, তিনি কোটি কোটি টাকার মালিক। শঙ্করলালের বিলাসিতা ষোল-আনার উপর। সোমেনের যতদূর মনে হয়, শঙ্করলালকে সে খুব দামী স্যুট্ ছাড়া পরতে দেখেনি। সর্ব্বদা ফিটফাট—সাধারণের সঙ্গে মোটে মিশতো না। সোমেন কখনো মামার কাছে রঘুনাথকে একা আসতে দেখেনি, পার্শ্বচর হিসাবে শঙ্করলাল বরাবর এসেছে রঘুনাথের সঙ্গে।

সোমেনকে ডেকে রঘুনাথ কথাবার্ত্তা বলতেন, শঙ্করলাল কিন্তু সোমেনের সঙ্গে কখনো একটি কথা বলেনি! কে জানে, কেন সোমেনের ওকে ভালো লাগে না! শঙ্করলালকে চিরদিন সে এড়িয়ে এসেছে।

প্লেনে সেই শঙ্করলালকে আলাপ করতে দেখে সোমেন সঙ্কুচিত হলো।

ঐ ভারতের মাটি দেখা যায়!

উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সোমেনের মুখ। পলকহীন নেত্রে সে তাকিয়ে আছে!

ক' বছর দেশ-ছাড়া! দেশকে কি নিবিড়ভাবে না ভালোবাসে! তাকে যখন য়ুরোপে পাঠাবার কথা হয়, সে স্পষ্ট বলেছিল, যাবে না,—কিন্তু যেতে হলো শেষে!

ক' বছর পরে দেশের মাটিতে ফিরে আসছে,—কি দেখবে, কে জানে!

দুই

শ্যামবাজারে আশু চৌধুরীর অত-বড় বাড়ী একেবারে নিঝুম নিস্তব্ধ। সোমেন যখন বিলাত যায়, তখন সব সময় লোকজনে গম্‌গম্‌ করতো—আর আজ নিঝুম, নিস্তব্ধ!

মা জানেন, সোমেন ফিরেছে—তবু তিনি নিজের ঘর থেকে বেরোননি! সারা বাড়ী ঘিরে বিষাদের মলিন ছায়া! সোমেনের বুকখানা ছাঁৎ করে উঠলো।

সামনে দেখলো গোবিন্দকে। একান্ত বিশ্বাসী ভৃত্য সে—বন্ধু বললেও চলে।

সোমেনকে দেখে মৃদু কণ্ঠে গোবিন্দ বলে উঠলো, "বাবু···খোকা বাবু···"

আত্মসম্বরণ করতে পারলো না গোবিন্দ—কেঁদে ফেললো।

ক্রমে সোমেন সব শুনলো···আশু চৌধুরী খুন হয়েছেন! কার হাতে খুন, কে জানে!

এমনি কিছু বিপদ হয়েছে, সোমেন ভেবেছিল! তবে খুন? কি সর্ব্বনাশ! আশু চৌধুরীর মত লোককে কেউ খুন করতে পারে, এ যে স্বপ্নের অগোচর! স্বাভাবিক মরা-বাঁচা কারো হাত-ধরা নয় অবশ্য—তা বলে খুন!

অনেকক্ষণ নির্ব্বাক হয়ে থাকে সোমেন !

পিতাকে জ্ঞান হওয়া অবধি সে দেখেনি। যখন তিন মাসের শিশু, তখন তার পিতা বর্ম্মায় যান। সেখান থেকে আর ফেরেননি ! তাঁর কোন সন্ধানও পাওয়া যায়নি। সোমেন শুনেছে, পিতা ভাগ্য-অন্বেষণে বর্ম্মায় গিয়েছিলেন। সেখানে কাঠের ব্যবসায় তিনি যথেষ্ট বিত্তশালী হয়ে ওঠেন। স্ত্রীকে কোনো দিন সেখানে নিয়ে যাননি। নিজে বছরে দু-একবার করে আসতেন। সোমেন হবার পর তিনি এসে একমাস কলকাতায় ছিলেন। তারপর সেখানে চলে যান, আর ফেরেননি ! তাঁর কোনো খবরও পাওয়া যায়নি !

দীর্ঘ উৎকণ্ঠার পর সোমেনের মাতুল আশু চৌধুরী খবর পান, সোমেনের পিতা অবনীনাথ বর্ম্মা যাওয়ার পথে দৈব-দুর্ঘটনায় মারা গেছেন !

ভগিনী এবং ভাগিনেয়কে আশু চৌধুরী নিজের কাছে রাখেন এবং ভাগিনেয়কে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে মানুষ করে তোলবার দিকেই তাঁর লক্ষ্য ছিল।

আশু চৌধুরী বিবাহ করেননি। সংসারে নিজে এবং ভগিনী কমলা। দুটি ভাই-বোন ছেলেবেলা থেকে বরাবর একসঙ্গে ছিলেন।

আজ কুড়ি বছর হলো, গঙ্গার ধারে এ-বাড়ী কিনে তিনি সুন্দর করে সাজিয়েছেন। তাঁর বাড়ী, কারবার আর বিষয়-সম্পত্তির মালিক হবে সোমেন—এ কথা সকলে জানে !

মামা পাকা ব্যবসায়ী, সোমেন তা জানে। দীর্ঘকাল শ্যামবাজারে বাস করার জন্য নয়—পল্লীর প্রত্যেকটি হিতকর অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া,

অযাচিত ভাবে অর্থ সাহায্য করার জন্যই সকলে তাঁকে চিনতো। ব্যবসায় তিনি যেমন প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেছেন, দানও তেমনি। কেবল পাড়ায় নয় যে-কোনো জায়গায় ভালো কাজে তিনি অর্থ দান করেছেন।

আশু চৌধুরীকে সকলে চেনে, সকলে জানে। তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালে কাকেও তিনি শুধু-হাতে ফেরাতেন না।

এরকম লোকের এমন শত্রু কে আছে? কে তাঁকে খুন করলে?

অনেকক্ষণ স্তম্ভিত তন্ময় থেকে সোমেন আর্দ্রকণ্ঠে বললে, "কিন্তু কে এমন তাঁর শত্রু, গোবিন্দ? মামা কারো অনিষ্ট করেননি। সকলকে আপনার জনের মত ভালোবাসতেন—তাঁকেও সকলে ভালোবাসতো।"

গোবিন্দও তাই বলে।

মায়ের সঙ্গে দেখা—মায়ের পানে সে তাকাতে পারে না! কমলা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছেন!

বাহিরে বিরাট পৃথিবীর খবর মা জানেন না! সংসার নিয়েই তিনি ব্যস্ত, বাইরে মামার কাছে কে আসছে না আসছে, তার কিছু তিনি জানেন না।

পুলিশ তদন্ত করছে, কিন্তু পুলিশের উপর সোমেনের এতটুকু আস্থা নেই!

সোমেন ফিরেছে খবর পেয়ে থানার অফিসার-ইন-চার্জ নীরেন দত্ত এসে দেখা করলেন।

সদম্ভে তিনি বললেন, "অর্ডিনারী খুনের কেস, সোমেনবাবু—তা ছাড়া আর কিছু নয়! ব্যবসায়ী লোক—সেদিন নিশ্চয় কিছু টাকা

পেয়েছিলেন, কেউ হয়তো জেনেছিল! বেশীর ভাগই তো অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জেগে থাকতেন···হিসাব-পত্র দেখতেন। জানলার নীচে যে পাইপটা মাটি পর্য্যন্ত নেমে গেছে, সেই পাইপ বেয়ে খুনী উপরে উঠে কোনো রকমে খুন করেছে, আর টাকা-কড়ি যা সামনে পেয়েছে, হাতিয়ে নিয়ে পালিয়েছে।"

সন্দিগ্ধ কণ্ঠে সোমেন বলে, "কিন্তু মা বললেন, সিন্দুক, আলমারি কিছুতে হাত দেয়নি! টাকা-কড়ি যেমন ছিল, তেমনি রয়েছে।"

তাচ্ছল্যের ভাবে, ইনেস্পেক্টর নীরেন দত্ত বললেন, "তা কখনও হয়? উনি মেয়েমানুষ—কি করে জানবেন, সিন্দুক-আলমারিতে কত টাকা ছিল? হয়তো কারো সাড়া পেয়ে সব টাকা সরাতে পারেনি, হাতের গোড়ায় যা পেয়েছে, তাই নিয়ে তাড়াতাড়ি সরে পড়েছে! প্রথম-দিন এনকোয়ারিতে এসে ঘরে আমরা রীতিমত ধস্তাধস্তির চিহ্ন দেখেছি। ঘরের মেঝেয় আশুবাবুর দেহ পড়েছিল। কপালের পাশে একটা ছুঁচ ফোটানোর মত লাল দাগ মাত্র। পরীক্ষা করে জানা গেছে, ধস্তাধস্তিতে তাঁকে কাহিল করে ফেলে তাঁর কপালের পাশে অর্থাৎ রগের শিরায় দারুন মারাত্মক কোনো বিষ ইন্‌জেক্‌শন করা হয়েছে—সেই বিষের ফলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে মারা গেছেন!"

নীরেন দত্তর পানে বিস্ফারিত চোখে সোমেন তাকিয়ে থাকে। তারপর জিজ্ঞাসা করে, "কোনো ডাক্তার পরীক্ষা করেছিলেন নিশ্চয়! তাঁর রিপোর্ট?"

নীরেন দত্ত গম্ভীরমুখে বললেন, "আপনারা পুলিশকে যাই মনে করুন, এ কথা ঠিক জানবেন,—পুলিশ ঘাস খায় না, চোখ বুজে পথ চলে না, আর নির্দ্দোষকে জেলে টানে না! আপনি এসেছেন শুনে শুধু

দেখা করতেই আসিনি! আপনাকে জানাচ্ছি—থানায় যাবেন, আমাদের রিপোর্ট, ডাক্তারের রিপোর্ট নিজের চোখে দেখবেন। তবে এ-কথা জেনে রাখুন, অর্ডিনারি কেস। কিন্তু হ্যাঁ, খুনীকে যত শীঘ্র পারি, ধরে দেবো! আপনাকে তার জন্য ভাবতে হবে না।"

হাসিমুখে তিনি বিদায় গ্রহণ করেন।

তিন

অকস্মাৎ দেবাশীষ এসে উপস্থিত।

যেন মেঘ না চাইতে জল! তার কথাই সোমেন ভাবছিল, দেবাশীষকে যদি পাওয়া যেতো!

এমন বন্ধু তার নেই আর! স্কুলে-কলেজে একসঙ্গে পড়েছে····· দু'জনে ছাড়াছাড়ি হতো না একদণ্ড। দেবাশীষ এখন প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ হিসাবে বেশ খ্যাতি অর্জ্জন করেছে! এ-কাজ তার ভালো লাগে! লোক-চরিত্র জানতে সে এ-কাজ গ্রহণ করেছে! কলেজে পড়বার সময় অপরাধ-তত্ত্বের নানা জটিল সমস্যার আলোচনায় দেবাশীষ রীতিমত চমকে দিত সোমেনকে! বলতো, মানুষের মনের মধ্যে এত রকম বৃত্তির উদয়াস্ত চলেছে—মেঘ আর রৌদ্রের মত—যে তার অনুশীলন করতে বসলে আশ্চর্য্য হতে হয়! দেবাশীষ বলতো, এই যে সব চুরি-জুয়াচুরি, জাল-জালিয়াতী, খুন হচ্ছে দুনিয়ায়, এ সব ব্যাপারের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করো যদি তো দেখবে, আসামী ধরবার জন্য পুলিশ যা করে, তাতে নিরেট আহাম্মকীর পরিচয় পাই শুধু! আমার ইচ্ছা আছে,

আমি এই অপরাধ-তত্ত্ব নিয়ে আজীবন থাকবো, এবং প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভের কাজ করবো।"

দেবাশীষ তার কথা শেষ করবার আগেই সোমেন তাকে এমন বিদ্রূপ-বাণে জর্জ্জরিত করতো যে দেবাশীষ চুপ করে যেতো!

সোমেন বলতো, "তোমার এমন বিদ্যাবুদ্ধি···এ নিয়ে জীবনে যে-কোনো লাইনে শাইন করবে তুমি দেবাশীষ—তা নয়, এ কি পাগলের স্বপ্ন দেখা!"

য়ুরোপে থাকতে এদেশী দু-একখানা কাগজের মারফত বন্ধুর দিগ্বিজয়ের সংবাদ সোমেন পেয়েছে, তাই দেবাশীষের কথাই তার বার-বার মনে পড়ছিল।

মামার এই শোচনীয় মৃত্যু! সোমেন এতে মর্ম্মান্তিক বেদনা পেয়েছে। নীরেন দত্ত সাধারণ খুন বলে রিপোর্ট দিলেও সোমেনের বিশ্বাস হয়নি! সে ডাক্তারী পাশ করে এসেছে, মৃত দেহ যদি একবার দেখতে পেতো, পরীক্ষা করে অনেক কিছু হয়তো জানতে পারতো! এখন পরের কথায় নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই!

মেডিকেল রিপোর্টে যা আছে, তার মর্ম্ম—আশু চৌধুরীর দেহে যে-বিষ পাওয়া গেছে, সে-বিষ সঞ্চারিত হয়েছে কপালের পাশে অর্থাৎ রগে, ইন্‌জেক্‌শনের মারফত। এ বিষ সাধারণ ডাক্তারখানায় মিলবে না—খুব সম্ভব, বিদেশ থেকে আমদানি!

তাই সোমেন ভাবছিল দেবাশীষের কথা।

তার খোঁজে গোবিন্দকে পাঠিয়েছিল। দেবাশীষ থাকে নৈহাটীতে। কলকাতায় একটা অফিস রেখেছে। তা রাখলেও নৈহাটী থেকেই যাতায়াত করে—কলকাতায় থাকে না।

গোবিন্দ তাকে খবর দেছে, দেবাশীষ গেছে মুর্শিদাবাদের ওদিকে। তিন দিনের মধ্যে ফেরবার কথা ছিল—কিন্তু সাত দিন হয়ে গেছে, এখনো ফেরেনি! কোনো খবরও দেয়নি, সেজন্য বাড়ীর সকলে চিন্তাকুল আছেন।

হতাশ হয় সোমেন।

খুনীকে পুলিশ ধরতে পারবে, সে আশা সোমেনের নেই।

এমন সময় দেবাশীষ নিজে এসে উপস্থিত! সোমেন যেন আকাশের চাঁদ পেলো হাতে! আবেগে দেবাশীষকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে সোমেন বললে, "বহুকাল বাঁচবে দেবু, তোমার ধ্যানে কি-রকম তন্ময় আমি!"

আলিঙ্গন-পাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে দেবাশীষ বললে, "দেশে ফিরেই আমার ধ্যানে তন্ময়! ব্যাপার কি?"

সোমেন বললে, "এখানকার খবর জানো না—হোয়াট গ্রেট ট্রাজেডি! খবরের কাগজে পড়োনি?"

দেবাশীষের দুচোখে আকুল ভাব—সে বললে, "কি খবর?"

সোমেন বললে, সব কথা·····সুইজার্লাণ্ডে হঠাৎ মার কেব্‌ল্ পায়—জরুরী প্রয়োজন, চলে এসো। তারপর এসে শোনে, মামাবাবু খুন।

দেবাশীষ বললে, "আমি শুনেছি। মামাবাবু যখন মারা যান, আমি তখন নৈহাটীতে ছিলুম, খবর পেয়েই এসেছিলুম—সাধারণ দর্শক হিসাবে। নীরেন দত্ত আমাকে খুব চেনে। এবং চেনে বলেই সেদিন আমার সঙ্গে একটা কথা পর্য্যন্ত বলেনি! আমি একটা বিষয়ে কিছু বলতে গিয়েছিলুম, ও মুখ ফিরিয়ে সরে গেল

—আমার কথা কাণে গেলেও সঙ্গত মনে করলো না! যাকে বলে, রীতিমত অপমান। তাই মাসিমার সঙ্গে দেখা না করে বাইরে থেকেই আমি চলে গেছি। ঠিক করেছিলুম, তুমি এসে না ডাকলে এখানে আসবো না।"

খানিকক্ষণ সে চুপ করে রইলো, তারপর আবার বললে, "তা বলে মনে করো না, সাধারণ দর্শকের মত সরে গেছি! ভিতরে ভিতরে খোঁজ রাখছি। তদন্ত যা হয়েছে, তাতে ব্যাপারটা নিশ্চয় ধামা-চাপা থাকবে!"

সোমেন জিজ্ঞাসা করলে, "কিন্তু তুমি কি মনে করো দেবু, পুলিশ যা বলছে, ব্যাপার তা নয়?"

দেবাশীষ বললে, "নিশ্চয় নয়! আমি নিশ্চিন্ত বসে নেই সোমেন, আর সেই জন্যই বহরমপুরে গিয়েছিলুম। সেখানে কোনো সন্ধান না পেয়ে আমাকে যেতে হয় রণগ্রাম। গঙ্গার ওপারে বেশ দূরে সে গ্রাম—সেখানে।"

সোমেনের মুখ প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে, সে দেবাশীষের পানে তাকিয়ে থাকে।

দেবাশীষ বললে, "তাই ফিরতে তিন দিনের জায়গায় দশ দিন দেরী হলো। কম ঘুরেছি! ওপারে গিয়ে অবশ্য বাস পেয়েছিলুম, তবু হাঁটতে হয়েছে বড় কম নয়!"

তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে দেবাশীষ আবার বললে, "এদিকে খবর কি? মাসিমা কেমন আছেন? পরীক্ষার পর কিছুদিন বিলেতে ঘুরে সব দেখবে-শুনবে তারপর দেশের ছেলে দেশে ফিরবে—তা নয়…"

সোমেন শুষ্ক-হাসি হাসলো, বললে, "মানুষ অনেক কিছু ভাবে কিন্তু তার ক'টা সফল হয়? বললুম তো, সুইজার্লাণ্ডে থাকতে মার কেব্‌ল্ গেল। প্লেন পাই না—ভাগ্যে তেওয়ারী সাহেব সেখানে ছিলেন —তাঁর প্লেনে তাঁর সঙ্গে ফিরেছি!"

"তেওয়ারী! মানে, রঘুনাথ তেওয়ারী?"

দেবাশীষের মুখে কেমন রহস্যের হাসি! সে বললে, "তিনি হঠাৎ সেখানে গেলেন কবে? এই তো মামাবাবু যখন মারা যান, এইখানেই ছিলেন, জানি। মামাবাবু মারা গেছেন খবর পেয়ে পুলিশ আসবার আগেই ওঁর ম্যানেজারকে এ বাড়ীতে পাঠিয়েছিলেন। ম্যানেজার হে! ঐ যে ভদ্রলোক···খাশা চেহারা! যেন কার্ত্তিকটি!"

সোমেন বললে, "হ্যাঁ, শঙ্করলাল। কিন্তু পুলিশ আসবার আগে তেওয়ারী-সাহেব খবর পেয়ে শঙ্করলালকে পাঠালেন কি করে?"

দুচোখে সংশয়! সোমেন তাকালো দেবাশীষের পানে!

দেবাশীষ হাসে। সে বলে, "সে কথা তেওয়ারী-সাহেব জানেন! আমার মনে হয়, উনি জ্যোতিষ-শাস্ত্রে খুব পণ্ডিত, তাই রাত্রে খুন হবার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের কাক-পক্ষীও যখন সে-খুনের কথা টের পায়নি —মাসিমা শুধু জানতে পেরে গোবিন্দকে দিয়ে থানায় খবর পাঠান— তার আগে তেওয়ারী-সাহেব জেনেছেন! জেনে শঙ্করলালকে এ-বাড়ীতে পাঠিয়েছেন! আশ্চর্য্য! শুধু তাই নয়। শঙ্করলাল ঘরে এসেছে, এসে সব জানলা-দরজা বন্ধ করেছে। যাবার সময় ঘর থেকে সকলকে বার করে দরজা বন্ধ করে তবে সে চলে গেছে।"

সোমেন বিস্ময়ে তার পানে তাকিয়ে আছে—তার চোখে পলক পড়ে না!

চার

বেলুড়ে গঙ্গার ধারে রঘুনাথ তেওয়ারীর প্রকাণ্ড বাড়ী!

গঙ্গার গা বয়ে মস্ত বাগান। বাগানে শুধু ফুলগাছ নয়, ফলের গাছও বিস্তর! বাগানের পাশ দিয়ে কাঁকর-ফেলা পথ ঘাটে গেছে। পাঁচিলে-ঘেরা বাগান। মাঝখানে দরজা। এই দরজা দিয়ে ঘাটে যাওয়া যায়। তেওয়ারী সাহেবের নিজের মোটর-লঞ্চ ঘাটে সব সময়ে মোতায়েন আছে। মাঝে মাঝে সন্ধ্যার দিকে গঙ্গা-বক্ষে শঙ্করলালকে এই লঞ্চে করে বেড়াতে দেখা যায়। রঘুনাথ তেওয়ারী কাজের মানুষ —টাকা-কড়ির নেশায় কোনো দিন তাঁর এমন অবসর মেলে না, গঙ্গার বুকে লঞ্চে চড়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াবেন!

দশ-বারো বছর আগে রঘুনাথ তেওয়ারী বহু টাকা দাম দিয়ে বাড়ীখানি কিনেছেন। এক বড় জমিদারের বাগান-বাড়ী ছিল— ব্যবসায় কিছু না বুঝে বন্ধুদের পরামর্শে ব্যবসা করতে গিয়ে তাঁর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি নষ্ট হয়। বাড়ী যিনি বন্ধক রেখেছিলেন, টাকা আদায়ের কোনো উপায় না দেখে শেষে নিলামে এ-বাড়ী বেচে দেন।

বাড়ীটি রঘুনাথ আগাগোড়া শুধু মেরামত করাননি, বাড়িয়েছেন। গঙ্গার দিকে অনেক ঘর আর বারান্দা তৈরী করিয়েছেন! গঙ্গা থেকে বাড়ীখানি দেখায় যেন রাজার প্রাসাদ! শোভায় সমৃদ্ধিতে অনুপম!

বাড়ীর বাইরে অনেক জায়গা-জমিও কিনেছেন পরে। সে-সব জায়গা পতিত ছিল। এখানে-সেখানে গরীবদের কুঁড়ে ঘর ছিল—আগাগোড়া জঙ্গল ছিল—সে-সবও কিনে নেছেন। রঘুনাথ এখানে আলুমিনিয়ামের কারখানা করেছেন।

কলকাতায় রাজা-কাটরায় এবং ষ্ট্রাণ্ড রোডে রঘুনাথ তেওয়ারীর বাড়ী আছে। অফিস নেতাজী সুভাষ রোডে। একটা-দুটো কাজ নয়, জুটমিল আছে, লোহার কারবার আছে—ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য নানা জায়গায় যেতে হয় তাঁকে। ভারত ছাড়িয়ে দেশ-বিদেশেও তাঁর কারবার ছড়িয়ে পড়েছে।

লোকে বলে, কপালে-পুরুষ! কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নয়। রঘুনাথের বাপ ব্রজনন্দন একদিন এ-বাড়ীর দরোয়ান হয়ে দরজায় পাহারা দেছে। স্ত্রী-পুত্র দেশে থাকতো। ব্রজনন্দন মাঝে মাঝে দেশে যেতো। স্ত্রী মারা গেল চার-বছরের ছেলে রঘুনাথকে রেখে—তখন ব্রজনন্দন তাকে এখানে নিয়ে আসে। সেই থেকে দেশের সঙ্গে তার আর সম্পর্ক ছিল না।

রঘুনাথ এই বাড়ীতেই মানুষ। বাড়ীর মেয়েরা ছোট ছেলেটাকে ভালোবাসতেন, বাড়ীর ছেলের মতই তাকে দেখতেন।

দরোয়ান ব্রজনন্দন তেওয়ারীর সেই ছেলে রঘুনন্দন আজ এ বাড়ীর মালিক! কত টাকার মালিক—লোকে সঠিক বলতে না পারলেও আন্দাজ করে।

সেদিনকার দু-একজন লোক আজও বেঁচে আছে। আছে মোক্ষদা দাসী, আছে অক্ষয় ঘোষ। মোক্ষদার বয়স সত্তর পেরিয়ে পঁচাত্তর হবে, অক্ষয় ঘোষের আশী পার হয়েছে। সদাশয় রঘুনাথ এদের তাড়াননি!

বাগানের দিকে মালিদের থাকবার জন্য যে টানা ঘর বহুকাল থেকে আছে, তাতেই ওরা থাকতে পেয়েছে। বাঙালী রাঁধুনি আছে, তার কাছে ওরা খায়।

অর্থাৎ রঘুনাথ তেওয়ারী সে-কালের কিছুই নষ্ট করেননি। আগেকার জমিদারের যে-সব জিনিষ-পত্র বাড়ীতে ছিল, সেগুলো নীচের একটা বড় ঘরে রেখে দিয়েছেন—বিক্রী করেননি, দানও করেননি।

এত বড় বাড়ী—স্ত্রী নেই। রঘুনাথ কবে নাকি দেশে গিয়ে বিবাহ করেছিলেন শোনা যায়,—স্ত্রীকে কেউ কলকাতার বাড়ীতে বা এখানে দেখেনি। লোকে বলে, স্ত্রী বহু কাল আগে দেশেই মারা গেছেন, তারপর রঘুনাথ আর বিবাহ করেননি। করবার বাসনাও জীবনে আর উদয় হয়নি!

নীচের তলায় অফিস-বাড়ী। সামনে কারখানা। কারখানার ম্যানেজার মাঝে মাঝে এখানে আসেন। এখানে কাজকর্ম্ম যা হয়, বাইরের লোকের কাছে তা অগোচর। রঘুনাথের প্রাইভেট অফিস এখানে। শঙ্করলালই এতকাল তাঁর কাজ চালিয়ে এসেছে, এখন বছরখানেক হলো এসেছে শান্তা।

টাইপিষ্টের চাকরি নেবার জন্য শান্তা একদিন রঘুনাথের নেতাজী সুভাষ রোডের অফিসে এসেছিল। পরিচয় দেয়, শান্তা তার বন্ধু চিরঞ্জীলালের কন্যা। বহুকাল আগে চিরঞ্জীলাল বম্বে গিয়েছিল, সেখানে বিবাহ করে বাস করছিল। তার এক কন্যা আছে, এ সংবাদ রঘুনাথ জানতেন না। বাপের চিঠি নিয়ে শান্তা আসে তাঁর কাছে। চিরঞ্জীলাল মারা যাবার সময় সহায়-সম্পদহীনা বি. এ.,

পাশ মেয়েকে বাপের পুরাতন বন্ধু রঘুনাথ তেওয়ারীর কাছে আসবার কথা বলে গেছেন।

বন্ধু-কন্যাকে রঘুনাথ গ্রহণ করলেন।

অফিসের কাজে নয়—বাড়ীর কাজের জন্য তিনি শান্তাকে নিয়েছেন। আঠারো-উনিশ বছর বয়স—সুন্দরী মেয়ে শান্তা, গত বছর বি. এ. পাশ করেছে। বিস্মিত হয়ে যান ইংরাজী-অনভিজ্ঞ রঘুনাথ—এইটুকু মেয়ে কেমন করে বি. এ পাশ করলো!

তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী—ভয়ানক চটপটে মেয়ে শান্তা। সে বোঝে, শঙ্করলাল তাকে ঠিক আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করেনি।

কালো চশমার আড়াল থেকে শঙ্করলালকে সে লক্ষ্য করে, তার মুখের বাঁকা হাসি শান্তার দৃষ্টি এড়ায় না।

একদিক দিয়ে শঙ্করলাল নিশ্চিন্ত—শান্তা বাংলা জানে না। চিরকাল বম্বেতে কাটিয়েছে এক হোষ্টেলে, ইংরাজী তার মাতৃভাষার মত হয়ে গেছে। বাবা ইংরাজী জানতেন না—কাজেই হিন্দীটাও তাকে ভালোরকম শিখতে হয়েছে।

শঙ্করলাল দু-চার দিন তার উপর অলক্ষ্যে লক্ষ্য রেখেছিল, তারপর শঙ্করলালের মন হলো নিঃসংশয়।

দোতলার একাংশে থাকেন রঘুনাথ, অপর অংশে শঙ্করলাল—ওধারের নূতন বাড়ীতে শান্তার আস্তানা নির্দ্দিষ্ট হলো। তার জন্য দুজন হিন্দুস্থানী দাসী মোতায়েন হলো।

রঘুনাথ তেওয়ারীর কাজের ভার শান্তা এবং শঙ্করলাল তুলে নেছে নিজেদের হাতে। শান্তার কাজের উপর অলক্ষ্যে শঙ্করলাল লক্ষ্য রাখছে, শান্তা তা বুঝেছিল।

পাঁচ

বেলা তখন আটটা।

বাড়ীতে কাজের চাপে রঘুনাথ কাল কলকাতার হেড-অফিসে যেতে পারেননি। আলুমিনিয়াম কারখানার শ্রমিকরা তাদের দৈনিক কাজের জন্য মজুরী বাড়াবার দাবী জানিয়েছে—সেইজন্য কাল রঘুনাথের অফিসে যাওয়া হয়নি। আজ অফিসে যাবেন, বাড়ীর কাজ তাই তাড়াতাড়ি সেরে নিচ্ছেন।

স্নানান্তে নিত্যকার শিবপূজা শেষ করে তিনি বে বেন, ভৃত্য এসে জানালো, কলকাতা থেকে দুজন বাঙালীবাবু এসেছেন—দেখা করতে চান।

রঘুনাথ বিকৃতমুখে বললেন, "কলকাতা থেকে বাবুদের এখানে আসবার কোন কারণ দেখি না! যা-কিছু দরকার, ওখানে অফিসেই হতে পারে। চলো, দেখি, কে?"

নীচে নেমে এসে দেখেন, বারন্দায় সোমেন,—দেবাশীষ পাশের বাগানে ফুলের উপচার দেখছে।

রঘুনাথের মুখের বিরক্ত ভাব দূর হলো। "ও সোমা এসেছো! আমি মনে করছি, কে—তাই হাঁকিয়ে দিচ্ছিলুম। তুমি—ও, সেই দমদমে নামাবার পর তোমার সঙ্গে দেখাই হয়নি! রোজ ভাবছি, ওখানে যাবো, তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করবো—কিন্তু য়ুরোপ থেকে ফিরে অবধি কাজে এমন জড়িয়ে পড়েছি, এক-মিনিট ফুরশৎ মিলছে না। ক' দিন ছিলুম না—অফিসে গোলমাল,

কারখানায় গোলমাল—একটা না একটা লেগেই আছে। এসো, ঘরে —তিন কোয়ার্টার সময় তোমায় দিতে পারবো।"

সোমেন দেবাশীষকে ডাকে, "এসো দেবু!"

দেবাশীষ এলো!

রঘুনাথের বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে দেবাশীষ বলে, "আপনার বাগান দেখছিলুম, মিষ্টার তেওয়ারী! চমৎকার বাগান! এর মধ্যে এ পাশে ঐ যে টক্‌টকে লাল ফুলগুলো, ও ফুল এদেশে আমি আর কোথাও দেখিনি। নিশ্চয় অন্য কোনো দেশ থেকে এনেছেন! ভারী চমৎকার ফুল!"

রঘুনাথ বললেন, "ফুলের সখ শঙ্করলালের। যেখানে যায়, ভালো ফুল দেখলেই যত দাম হোক—তার চারা সংগ্রহ করবেই। ওফুল-গাছ শঙ্করলাল যখন আমার সঙ্গে নিউ-গিনি গিয়েছিল, তখন সেখান থেকে আনে।"

স্মিতমুখে দেবাশীষ প্রশংসা করে, "চমৎকার! সত্যি, চমৎকার! শঙ্করলাল বাবুর সখ আছে বটে! আবার সখ থাকলেই শুধু হয় না—পয়সা থাকা চাই। এই দেখুন না···এই আমি—

প্রাণটি সখের বটে—
হাতে কিন্তু পয়সা নাই!
ইচ্ছা করে বগি চড়ি—
উল্টে পাল্টে পড়ে যাই।

এ ধরণের লোক আপনিও ঢের দেখে থাকতে পারেন। প্রাণে সখ আছে ষোল আনার উপর, অথচ ট্যাঁক একেবারে খালি! সেবার দার্জ্জিলিং গিয়ে কি একটা ফুল দেখলুম। গন্ধে—বলবো কি মশাই—যার অনিদ্রা

রোগ আছে, সেও ঘুমিয়ে পড়বে! ভাবলুম, একটা চারা কিনি, কিন্তু ট্যাঁক্ ধু-ধূ। আশা-ভরসা ছেড়ে শেষে মশাই, সেই গাছের গোড়ার মাটি এক মুঠো এনে যত্ন করে রেখেছি।"

তিনজনে ঘরে এসে তিনখানি চেয়ারে বসেছেন।

রঘুনাথ বললেন, "মাটি!"

দেবাশীষ বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, মাটি। ভাবলুম, দ্রব্য-গুণ তো, তা ছাড়া কিছু নয়। মাটির গুণেই এমন গাছ, এমন ফুল, তা ছাড়া আর কিছু নয়। যাই হোক—চমৎকার ফুল, গন্ধও তেমনি! মিষ্ট অথচ সাঙ্ঘাতিক!"

রঘুনাথ বিবর্ণ হয়ে বলেন—"তার মানে?"

দেবাশীষ বললে, "মানে জলের মত সোজা। বিদ্যুৎ ভারী সুন্দর, কিন্তু এই বিদ্যুৎ ছুঁলে মানুষ মারা যায়। সাপ দেখতে চমৎকার—আপনার হলের একপাশে চমৎকার দুটি সাপও দেখলুম। পুষেছেন নিশ্চয়! কারণ ওদের চেহারা সুন্দর! অনেক সাপ দেখেছি, দেখতে ভালো লাগে—কেমন এঁকে-বেঁকে সারা দেহে ঢেউ তুলে বুকে হেঁটে চলে! তবু বলবো—এমন সুন্দর সাপ আমি জীবনে দেখিনি! হলে ঢুকতেই ওই চমৎকার কাঁচের বাক্সে অতি চমৎকার সাপ নজরে পড়লো। চমৎকার সাপ—ওদের মুখের একটু ছোঁওয়ায় জীবনান্ত।"

"না, না, ওদের বিষ নেই!"

রঘুনাথ যেন অতিমাত্রায় সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন, বলেন, "জলঢোঁড়া নাকি আবার সাপ! এও ঐ শঙ্করলালের কীর্ত্তি। নিউ-গিনির সেই বুনোদের কাছ থেকে অনেক বেশী দাম দিয়ে ও দুটো কিনে কৌটোয় বন্ধ করে এনেছে। বড় নয়, এক-হাত লম্বা। ওদের ওই সোনার মত রং দেখে

ভুলে গেছে। তবে হ্যাঁ, বিষ নেই একেবারে। বিষাক্ত সাপ অমন নির্জ্জীব পড়ে থাকে না, এতক্ষণে ল্যাজের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ফণা তুলতো! ও রকম ভাবে থাকতো না।"

তিনি সোমেনের দিকে ফিরলেন, "থাক এসব অবান্তর কথা। আমায় ঠিক ন'টায় বেরুতে হবে, তার আগে কাজের কথা হোক। হ্যাঁ, খুনীর কোনো কিনারা হলো?"

সোমেন বললে, "না, কিছু হয়নি। পুলিশ বিশেষ কিছু করতে পারবে বলে মনেও হয় না!"

রঘুনাথ হাসলেন, বললেন, "এও কি একটা কথা! পুলিশই বরাবর এ-সব কাজ করে আসছে—চোর, ডাকাত, খুনী এদের পুলিশই ধরছে তো! এই সেদিন—এখনও একমাস হয়নি, আশুবাবু মারা গেছেন। এর মধ্যে আমি একদিন দত্তকে ফোন করেছিলুম। তিনি বললেন, সর্ব্ব কর্ম্ম ফেলে তিনি খুনীর সন্ধান করছেন। আমি বলেছি, বোধ হয় কাগজে দেখে থাকবে—আশু বাবুকে যে খুন করেছে—তাকে যে ধরিয়ে দিতে পারবে, আমি নিজে তাকে দু' হাজার টাকা পুরস্কার দেবো।"

সোমেন নির্ব্বাক, দেবাশীষ বিস্ফারিত চোখে রঘুনাথের পানে তাকিয়ে আছে।

রঘুনাথ বললেন, "আশুবাবু আমার কি-রকম বন্ধু ছিলেন—ওঃ! ব্যবসায় প্রথম থেকে তিনি ছিলেন আমার ডান হাত!"

কণ্ঠ পরিষ্কার করে সোমেন বললে, "আমিও সেই জন্য আপনার কাছে এসেছি। এ কদিন শ্রাদ্ধ-ট্রাদ্ধর জন্য কোথাও যাওয়া বা কথাবার্ত্তা হয়নি। আজ তিন দিন শ্রাদ্ধ মিটেছে, আমি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁর যা কিছু কাগজ-পত্র ছিল, সব দেখবার অবসর পেয়েছি।"

বলতে বলতে পকেট থেকে কতকগুলো ফিতা-বাঁধা কাগজ-পত্র বার করে সোমেন।

সোমেন বললে, "আমি জানতে পেরেছি, মামাবাবুও আলুমিনিয়াম ওয়ার্কশপের পার্টনার ছিলেন। আর—"

রঘুনাথের দুচোখ বিস্ফারিত হলো। কণ্ঠ কঠিন হলো। তিনি বললেন, "হ্যাঁ, কারবারের পত্তন হয় যখন, তখন তাই ছিলেন। কিন্তু তারপর তিনি তাঁর অংশ আমাকে বেচে দেন। তার কাগজপত্র তুমি ছাখোনি?"

"বেচে দিয়েছিলেন!"

রঘুনাথ বললেন, "হ্যাঁ, তিনি চল্লিশ হাজার টাকা নগদ দাম নিয়ে আমায় বিক্রী করেছেন। তার দলিল আছে। তাছাড়া রেজিষ্ট্রী অফিসে খোঁজ করলেও জানতে পারবে।"

এক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে সোমেন বললে, "হতে পারে। আপনি মিথ্যা কথা বলবেন না, জানি। আপনার ব্যাঙ্কে মামাবাবুর এক লাখ টাকা জমা আছে। সেটা—"

হো-হো করে হেসে ওঠেন রঘুনাথ। বলেন, "কিন্তু সে টাকাও তিনি যেদিন মারা যান, তার দুদিন আগে তুলে নিয়ে আসেন। হিসাব-পত্র তুমি দেখতে পারো। আর বহু লোকের সামনে সে-টাকা তিনি নেছেন···যথেষ্ট প্রমাণ আছে।"

সোমেনের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।

তার বিবর্ণ মুখের পানে তাকিয়ে রঘুনাথ বললেন, "আমি তাঁর সব কথাই জানি সোমা, কোনো দিন তিনি কোনো কথা আমার কাছে গোপন করেননি। আমায় না-জানিয়ে তিনি নিজে অনেক রকম ব্যবসা

আরম্ভ করেছিলেন। তাই করার ফলে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হয়ে পড়েন। শেষ বয়সে তিনি রেশ খেলতে সুরু করেন—বড় পরিতাপের বিষয়!"

"রেশ!"

সোমেন একেবারে বিশ্বাস করতে পারে না!

রঘুনাথ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, "হ্যাঁ, রেশ খেলা। অনেকে জানে। দুর্গতির চরম হয়—তখন সব ফিরিয়ে পাবার জন্য তিনি যে কি না করেছেন পাঁচজনের কথায়!"

এই পর্য্যন্ত বলে একটু থেমে আবার বললেন, "অত্যন্ত দুঃখের কথা, শ্যামবাজারের অত-বড় বাড়ী—সে-বাড়ীও তিনি তিন মাস আগে আমার কাছে এক বৎসরের কড়ারে বন্ধক রেখে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে ছিলেন। রেশ খেলে দু দিনে সে-সব টাকা উড়িয়ে দেছেন।"

অসহ্য! সোমেনের চোখের সামনে দুনিয়ার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে! মনে হয়, চেয়ার থেকে সে পড়ে যাবে!

"স্যর—এটাতে একটা সাইন করতে হবে।"

খট্ খট্ করে ঘরে ঢুকলো শান্তা।

বব-করা চুল, চোখে কালো চশমা—সেই চশমার ফাঁকে একবার সে এ দুই তরুণ আগন্তুককে দেখে নিলে।

টেবিলের উপর কাগজটা রেখে নাম সহি করেন রঘুনাথ। দেওয়ালের ঘড়িতে নটা বাজে! শান্তা চলে গেল। সে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে রঘুনাথ উঠে দাঁড়ালেন।

এগিয়ে এসে তিনি দাঁড়ান সোমেনের সামনে। তার পিঠ চাপড়ে বললেন, "মুষড়ে পড়ো না সোমা। পুরুষ-মানুষ—সাহস করে দাঁড়াও। আচ্ছা, আজ আমি বেরুচ্ছি। আর একদিন তুমি এসো। কাগজ-পত্র

আমি তোমায় দেখাবো। সেগুলো শঙ্করলালের কাছে আছে। সে আজ বাড়ী নেই, জামসেদপুর গেছে। সে ফিরলে আমি তোমায় খবর দেবো। তুমি নিজের চোখে দেখলে বিশ্বাস করবে তখন।"

তিনি আর এক সেকেণ্ড দাঁড়ালেন না—দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

দেবাশীষ দাঁতে দাঁত চেপে কথা শুনছিল,—আর মানুষটিকে দেখছিল। দেবাশীষ বললে, "ওঠো, এখানে আর কেন?"

সোমেন উঠে দাঁড়ালো। তার গা কাঁপছে।

ছয়

এক কথায় পথের ভিখারী!

সোমেন একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে।

সান্ত্বনা দেয়, সাহস দেয় দেবাশীষ—রঘুনাথের কথা বিশ্বাস করতে পারে না।

কমলা-দেবীকে জানানো চলে না। কে জানে, শুনে তিনি সহ্য করতে পারবেন না হয়তো! সোমেনকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে দেবাশীষ চলে যাবে, গোবিন্দ এসে বললে, "মা ডাকছেন।"

দেবাশীষ একটু বিব্রত হলো। তাকে এখনই নেতাজী সুভাষ রোডের দিকে যেতে হবে—বিশেষ দরকার। কমলা দেবীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে দেরী হবে—অথচ উপায় নেই!

কমলা নিজের ঘরে ছিলেন, দেবাশীষ এলো তাঁর কাছে।

তাকে বসিয়ে কমলা বললেন, "আমার সঙ্গে দেখা না করেই চলে

যাচ্ছিলে দেবু! আমার মনে এদিকে কতখানি ভাবনা—তা বোঝো না, বাবা! তারপর কি হলো, শুনি? রঘুনাথ কি বললে?"

দেবাশীষ বললে, "অনেক কথা হয়েছে মাসিমা। এর পর আপনাকে বলবো। আজ এখন সময় হবে না—আমার অনেক কাজ রয়েছে।"

কমলা একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "তোমরা কিছু না বললেও আমি বুঝেছি। রঘুনাথ তেওয়ারীকে চিনতে আমার বাকী নেই বাবা। ওকে আমি বহুদিন আগে থেকেই চিনি।"

একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, "দাদা নির্বিরোধী মানুষ ছিলেন। সেই মানুষকে দিয়ে ও-লোক কি না করাতে চেয়েছে, যদি জানতে!"

আশু চৌধুরী যে-রাত্রে খুন হন—কমলা সে-রাত্রের কথা বললেন।

পাশাপাশি দু'ঘরে দু'জনে থাকতেন। যে-রাত্রে মারা যান—সেদিন সন্ধ্যার সময় নীচে বৈঠকখানা-ঘরে এসেছিল রঘুনাথ। দাদার সঙ্গে কি কথা হয়, কমলা তা জানেন না, তবে তেওয়ারী আর আশু চৌধুরী দু'জনেই যে খুব চেঁচিয়ে কথাবার্ত্তা কইছিলেন তাই শুনেই কমলার বুঝতে বাকী ছিল না।

দেবাশীষ বললে, "কিন্তু তেওয়ারী সেদিন সন্ধ্যার সময় এসেছিল, সে-কথা তো বললে না মাসিমা। এ কথা সে একেবারে চেপে গেছে।"

কমলা বললেন, "দাদার কাছে কিসের নাকি নক্‌সা আর কাগজ-পত্র ছিল, সেগুলো নেবার জন্য সে এসেছিল। কিন্তু দাদা দেননি। রাত্রে দাদা যখন খেতে এলেন, তখন তাঁকে ভয়ানক অন্যমনস্ক দেখেছিলুম। আমাকে দাদা কিছু বলেননি। খাওয়া-দাওয়ার পর দাদা নিজের ঘরে

গেলেন, আমি খানিক পরে বারান্দা দিয়ে যাবার সময় দেখি, দাদা টেবিলের উপর কতকগুলো কাগজ-পত্র ছড়িয়ে দেখছেন। দাদার সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা!"

বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো। আঁচলে চোখ চেপে তিনি ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলেন।

তার প্রায় আধ ঘণ্টা পরে দেবাশীষ চলে গেল।

নেতাজী সুভাষ রোডে ষ্ট্যাণ্ডের কাছে বাস থেকে নেমেই সে দেখলো শঙ্করলালকে—দু'জন লোকের সঙ্গে একান্ত নিবিষ্ট মনে কথা কইছে। দুনিয়ার কোনোদিকে তার লক্ষ্য নেই! দেবাশীষ মুখ ফিরিয়ে একপাশ দিয়ে সরে পড়লো—শঙ্করলাল যেন তাকে দেখতে না পায়!

রঘুনাথের লাল রংয়ের পাঁচ-তলা অফিসের সামনে এসে দেবাশীষ থমকে দাঁড়ালো।

গেটের সামনে মোটর দাঁড়িয়ে—তেওয়ারীর ছোট অষ্টিন। শান্তা অফিস থেকে বাইরে এলো,—একবার চারিদিকে তাকিয়ে মোটরে উঠলো। উঠেই সে মোটরে ষ্টার্ট দিলে।

দেবাশীষ দেখলো—শান্তার মুখে মৃদু হাসির রেখা! সে দেখলো শঙ্করলালও উঠলো শান্তার মোটরে। তারপর মোটরখানা দেবাশীষের পাশ ঘেঁষে তীরের বেগে বেরিয়ে গেল।

সরে না দাঁড়ালে দেবাশীষ হয়তো চাপা পড়তো! শঙ্করলালকে শান্তার সঙ্গে গাড়ীতে উঠতে দেখে দেবাশীষ একটু কেমন বিহ্বল হয়েছিল —চকিতের জন্য—গাড়ীখানা এখনি ষ্টার্ট দিয়ে তার গা ঘেঁষে যাবে, সে তা ভাবেনি।

শান্তা! মিস্ শান্তা!

কে এ মেয়েটি ? গোপনে দেবাশীষ সন্ধান নিয়েছে। মোক্ষদা আর অমর ঘোষের সঙ্গে কথা হয়েছে। ভদ্রবেশে যায়নি, গিয়েছিল মোক্ষদার বোন-পো-পরিচয়ে, তবে দরোয়ান তাকে ফটকে ঢুকতে দিয়েছিল। নাম বলেছিল সাধুচরণ।

দেশের লোক এবং সম্পর্কে বোন-পো হয় শুনে মোক্ষদা সাধুচরণকে কম যত্ন করেনি। স্বপ্নেও সে ভাবতে পারেনি—কোনো ভদ্রলোক সাধুচরণ নাম নিয়ে তার কাছে এসেছে !

কথায় কথায় যতটুকু খবর দরকার, দেবাশীষ তার কাছে পেয়েছে। শান্তা এসেছে বম্বে থেকে, তবে বাপের নাম চিরঞ্জীলাল, এককালে সে রঘুনাথের খুব বন্ধু ছিল ইত্যাদি।

চিরঞ্জীলাল নামটা শুনে দেবাশীষ চমকে ওঠে! বড় পরিচিত নাম যেন !

মোক্ষদার সঙ্গে পাঁচটা সুখ-দুঃখের কথাবার্ত্তা হয়।

অক্ষয় বলে, রঘুনাথ বাঙালীদের দু'চক্ষে দেখতে পারে না,—ওর চেয়ে শঙ্করলালের বাঙালী-বিদ্বেষ আবার আরো বেশী ! একদিন তাকে 'বাঙালী কুত্তা'—বলে জুতোর ঠোক্কর মেরেছিল! বৃদ্ধ অক্ষয় সে-দিনকার সে অপমান ভুলতে পারেনি—সামর্থ্য আর বয়স থাকলে সেই-দিনই শঙ্করলালের টুঁটি চেপে ধরতো ! এ কথা বহু আপশোষ করে সে বলেছিল বার-বার।

মোক্ষদার বোন-পো হিসাবেই সেদিন সে বাগানে ঘুরতে পেরেছিল —নূতন ফুল, ফুলগাছ, কাঁচের বাক্সে বন্ধ সাপ দুটো সেই দিনই সে দেখে যায়।

ঘুমপাড়ানী ফুল ! পপির জাত !

দেবাশীষ জানে, এ ফুলের গন্ধে যে-কোনো প্রাণীর ঘুম আসে। আর ওই সাপ দুটো?

অদ্ভুত সাপ! হলের একপাশে কাঁচের বাক্সে অতি সাবধানে দুটিকে রাখা হয়েছে।

মোক্ষদা বললে, "প্রথম যেদিন সাপ দুটো আসে, আমি লুকিয়ে দেখে এসেছি সাধু। উঃ সেদিন সাপ দুটোর কি তেজ! কি ফোঁশ-ফোঁশানি আর ছোবল মারা! এমন মোটা কাঁচ—কাঁচের গায়ে ঠকাঠক ছোবল মারছিল। তারপর একদিন কর্ত্তার সই যে চীনে চোকর আছে, সেই চীনে চাকরটা ওদের কি করলে, তারপর থেকে সাপ দুটো ঝিমিয়ে আছে—যেন কেঁচো! অক্ষয়-দা বলে, চীনে-ভূতটা সাপের বিষ বার করে নিয়েছে! অবাক কাণ্ড! সাপের বিষে কি হবে, কে জানে! অক্ষয়-দা বুড়ো হয়েছে তো, লাঠি ধরে ছিষ্টি জায়গা ঘুরে বেড়ায়, ওকে কেউ কিছু বলে না! অক্ষয়-দা বলে, চীনে-ভূতটা নাকি সাপের বিষ দিয়ে কি ওষুধ তৈরী করেছে।"

ওষুধ! সাপের বিষ!

দেবাশীষের মাথায় চকিতে জেগে উঠলো। আশু চৌধুরীর কপালের পাশে ইন্‌জেক্‌শনের দাগ! কে জানে, সে কিসের দাগ!

অনেকখানি আশার আলো যেন দেবাশীষ দেখতে পায়। ফিরে এসে সে বিশেষ করে খোঁজ করবে স্থির করে! তার মনে বেশ সন্দেহ, রঘুনাথ ঐ সাপের বিষ থেকে এমন কিছু তৈরী করিয়েছে, যা রক্তে মেশবার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু নিশ্চিত!

কারখানায় দু'তিনজন চীনা কাজ করে, শোনা গেল। তারা

বেশ মোটা টাকা মাহিনা পায়, রঘুনাথ তাদের একরকম মাথায় করে রেখেছে!

এরপর সাধুচরণ-বেশী দেবাশীষ বিদায় নেয়। মোক্ষদা সজল চোখে বার-বার বলে, "কলকাতায় এলে এখানে আসিস বাবা—একবার দেখা দিয়ে যাস। আর কদিন বা বাঁচবো? আর বাঁচবার ইচ্ছাও আমার নেই। বউমাকে বলিস, যদি আমায় নিয়ে যায়, তাহলে দুদিন গিয়ে দেশে থেকে আসি। এখানে থাকতে আমার ভালো লাগেনা আর।"

চোখের জল মোছে মোক্ষদা।

সাত

দিনের বেলায় সেদিন ভীষণ ডাকাতি।

ম্যাকফার্শন কোম্পানির লোকজন এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে জমা দিতে আসছিল—গাড়ীতে চারজন সশস্ত্র দরোয়ান, দু-জন কর্ম্মচারী। বেলুড়ে জি. টি. রোডের উপর পাশ দিয়ে আর একখানা মোটর যেতে যেতে হঠাৎ থেমে পড়লো।

মোটর থেকে ঝুপঝাপ করে পাঁচ-ছ'জন যুবা রিভলভার হাতে লাফিয়ে পড়লো—লাফিয়ে পড়েই গুলি চালাতে চালাতে তারা ম্যাক-ফার্শন কোম্পানির মোটরে চড়লো।

দুজন দরোয়ান পেলো সাংঘাতিক চোট—ড্রাইভারের পাত্তা মিললো না—সম্ভব, সে পালিয়েছে।

পাঁচ-মিনিটও সময় লাগলো না—গাড়ী লুঠ করে ডাকাতের দল নিজেদের মোটরে উঠেই তীর বেগে মোটর ছুটিয়ে অদৃশ্য !

পথের লোক নিশ্চল-নিস্পন্দ-চেতনহারা ! যাদের চেতনা ছিল, তারা নালা-নর্দ্দামা ভাঙ্গা বেড়া টোপ্‌কে সরে গেছে।

মুহূর্ত্তে পথ জনাকীর্ণ হয়ে উঠলো, পুলিশের ভ্যান এলো ছুটে।

কিন্তু কাকেও ধরা গেল না। আলমবাজার থেকে খানিক দূরে একটা বাগানে পাওয়া গেল মোটরখানা—ভাঙ্গা অবস্থায়। ডাকাতের দল আর টাকা—তাদের কোনো পাত্তা নেই !

চারিদিকে হুলুস্থুল পড়ে গেল। পুলিশের রক্ত তেতে উঠলো—তারা বেপরোয়া ধর-পাকড় সুরু করে দিলে।

কাগজে-কাগজে ছাপা হলো ডাকাতির খবর।

কাগজে সোমেন পড়লো এ খবর। দেবাশীষও পড়লো—পড়ে সে এলো সোমেনের কাছে।

হেসে সে বললে, "পড়েছো, তোমার তেওয়ারী সাহেবের আর এক কীর্ত্তি ?"

সোমেন বললে,—"দিন কাল যা পড়েছে, এ রকম ডাকাতি তো আখ্‌চার হচ্ছে।"

দেবাশীষ বললে, "আমি বলছি, বিশ্বাস করো—এটি তোমার তেওয়ারী-সাহেবের কীর্ত্তি। পড়েছো, একটি মেয়ে মোটর ড্রাইভ করছিল। পথের লোকজন কেউ কেউ দেখেছে ! তারা বলেছে, মেয়েটির চোখে কালো চশমা···কালো শাড়ী পরে ড্রাইভ করছিল। মেয়েটি আবার সুন্দরী। শান্তা ছাড়া এ আর অন্য-কেউ নয়—বর্ণনা শুনে তাই মনে হয়।"

সোমেন বললে, "তা না হয় হলো, কিন্তু এ টাকা তেওয়ারী-সাহেব এমন ডাকাতি করে লুঠ করবে, কথাটা অদ্ভুত নয় কি ?"

দেবাশীষ বললে, "এইখানেই তো মজা! আমি তোমায় একটা গল্প বলছি শোনো। সুদর্শন চৌধুরীকে মনে আছে,—আমাদের সঙ্গে পড়তো প্রেসিডেন্সী কলেজে ?"

সোমেন বললে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব মনে আছে! সুদর্শনকে ভুলবো কি! ব্রিলিয়াণ্ট ছেলে! দিন-রাত মনে কি ফূর্ত্তি! গম্ভীর মুখ কারো দেখতে পারতো না সে।"

দেবাশীষ বললে, "হ্যাঁ, এই ম্যাকফার্শন কোম্পানি—এ-হাত ও-হাত ঘুরে এলো শেষে সুদর্শনের কাকা মোহিনী চৌধুরীর হাতে। কোম্পানির সিনিয়র পার্টনার মোহিনী চৌধুরী, আর জুনিয়ার পার্টনার তোমার এই তেওয়ারী-সাহেব।"

সোমেন সবিস্ময়ে বললে, "বলো কি! এত খবর তুমি পেয়েছো ?"

দেবাশীষ বললে, "যেমন করেই হোক, পেয়েছি। মুর্শিদাবাদ গিয়েছিলুম। সুদর্শন অত্যন্ত বিপন্ন। এম. এ পাশ করেছে! তাতে কি —সাংসারিক জ্ঞান বলো, লোকচরিত্র জানা বলো—এ-সব নেই! তাই পদে-পদে বেচারী ঠকছে। আজ টেলিগ্রাম পেয়েছি—সুদর্শন আজই বহরমপুর থেকে আসছে। ক'দিন তাকে আমি তোমার এখানে রাখতে চাই। সেই ব্যবস্থা করতে এসেছি। আমার ওখানে তাকে রাখতে চাই না—তাতে তার জীবন সঙ্কটাপন্ন হতে পারে বলে ভয় হয়! আমার কাছেই সে আসছে।"

কথাটা সোমেন ঠিক বুঝতে পারলো না—দেবাশীষের দিকে তাকিয়ে রইলো।

দেবাশীষ বললে, "তার কাকা তার ভয়ানক শত্রু—বাগে পেলে মেরে ফেলে—এমন! বাইরের শত্রুকে পার আছে! কিন্তু ঘরের শত্রুর হাতে পার নেই! কাকার জন্যই সে আরো বহরমপুর ছেড়ে চলে আসছে। এই যে টাকা লুঠ হলো, এর মুল সেইখানে! ওর কাকার সঙ্গে পরামর্শ করে রঘুনাথ তেওয়ারী এ টাকা লুঠ করেছে। মোহিনী চৌধুরী উপস্থিত কপর্দ্দকহীন—সুদর্শনের বাপের সঙ্গে সম্পত্তি আধাআধি বখরা করে নিলেও নিজের কিছু রাখতে পারেননি—সব উড়িয়ে দিয়েছেন! এখন এ কারবারে সিনিয়র পার্টনার হিসাবে আজও তাঁর নাম চালু রয়েছে—অথচ টাকাটা হলো সুদর্শনের। কথা ছিল সামনের জানুয়ারি থেকে কারবারের সব-কিছু সুদর্শনের নামেই চলবে, মোহিনী চৌধুরীর নাম-গন্ধ থাকবে না। মোহিনী চৌধুরী রঘুনাথের শরণ নেন! এ-কাজ তিনি করিয়েছেন! মজা এই যে ডাকাত যে ধরে দেবে, তার জন্য মোটা টাকা রিওয়ার্ড দেবে বলে ইস্তাহার জারি করেছে তেওয়ারী।"

সোমেন একটা নিশ্বাস ফেললো—নিজের অসহায় অবস্থা চিন্তা করে।

সম্প্রতি মেডিকেল কলেজে সে চাকরিতে ঢুকেছে। মামাবাবুর ইচ্ছা ছিল, বিলাত থেকে পাশ করে এসে ব্যবসা করবে—মামাবাবু তার ব্যবস্থা করে দেবেন! এই উদ্দেশ্যে সামনের বড় বড় ক'টা ঘর দেখে ঠিক করেছিলেন। কিন্তু এমন দুর্ভাগ্য, বাড়ীও রঘুনাথের কাছে বাঁধা। কবে হয়তো বাড়ী ছেড়ে উঠে যেতে হবে!

দেবাশীষ তখনকার মত চলে এলো। সে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এলেন নীরেন দত্ত।

সোমেন বললে, "কি খবর নীরেন বাবু? কিনারা কিছু হলো?"

নীরেন দত্ত মৃদু হাসলেন, বললেন, "সব হয়েছে সোমেন বাবু, খুনীকে চোখের সামনে দেখছি—শুধু ধরবার ওয়াস্তা।"

সোমেন বললে, "চোখের সামনে খুনী, তবু ধরছেন না—এর মানে?"

নীরেন দত্ত পকেট থেকে একখানা কাগজ বার করলেন, বললেন, "এই দেখুন! সব প্রমাণ সঙ্গে না নিয়ে কি আর এমনি সেপাই শুদ্ধ হাজির হয়েছি! আপনার গোবিন্দর কীর্ত্তি!"

সোমেন যেন অজ্ঞান হবে!

নীরেন দত্ত বললেন, "হ্যাঁ মশাই, আপনাদের গোবিন্দ।"

সোমেন মাথা নাড়ে। "ক্ষেপেছেন আপনি! গোবিন্দ কতকাল আমাদের সংসারে আছে, আমাকে কোলে-পিঠে মানুষ করেছে। মামাবাবুর কতখানি বিশ্বাস ছিল গোবিন্দর উপর। বন্ধুর মত। তাঁর গোপনীয় কথা আমরা জানি না, গোবিন্দ সব জানে। আপনার মিথ্যা সন্দেহ নীরেন বাবু—একেবারে মিথ্যা!"

উত্তেজনায় সে উঠে দাঁড়ালো।

নীরেন দত্ত বললেন, "কিন্তু মনে রাখবেন—অত্যন্ত বিশ্বাসী যে, সে-ই বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগ পায়। আজ খবর পেয়েছি—যেদিন আশুবাবু খুন হন, সেইদিনই গোবিন্দর দেশ বাগেরহাট থেকে ওর এক ভাইপো এসেছিল। সে ভাইপোর আসবার কথা আপনার মা হয়তো জানেন না তার পরের দিন থেকে সে ভাইপোকে আর এ বাড়ীতে দেখা যায়নি! এবং আপনার গোবিন্দও শুনছি দেশে গেছে আজ কদিন।"

সোমেন তবু মাথা নাড়ে। সোমেন বলে, "কিন্তু আপনারা এ-খবর

রাখেন শঙ্করলাল সেদিন ভোরে এসেছিলেন এবং আমার মা, গোবিন্দ—সকলকে বার করে দিয়ে ঘরের দরজা জানলা সব বন্ধ করে দিয়েছিলেন ?"

নীরেন দত্ত হাসলেন, "পুলিশ সব খবর রাখে সোমেন বাবু। খুনীর পায়ের দাগ বা ধস্তাধস্তির চিহ্ন পাছে মুছে যায়, তাই শঙ্করলাল এঁদের বার করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে ছিলেন। আর যতক্ষণ না পুলিশ আসে, এনকোয়ারি হয়, ততক্ষণ তিনি এইখানেই ছিলেন। শঙ্করলাল আপনার মামাবাবুকে খুবই ভালো বাসতেন, দেখলুম। তাঁর কথা বলতে শঙ্করলালের চোখ জলে ভরে এলো।"

অধীর কণ্ঠে সোমেন বললে, "ও কথা যাক, গোবিন্দর সম্বন্ধে আপনি কি করবেন ?"

শান্তভাবে নীরেন দত্ত বললেন, "আজ তিন দিন হলো—তার দেশের বাড়ীতে তাকে গ্রেফ্‌তার করা হয়েছে, তার ভাইপোও গ্রেফ্‌তার হয়েছে। কিছু কিছু জিনিষ আমরা সার্চ্চ করবার সময় পেয়েছি। তাই বলছি, ওকে আপনি বিশ্বাস করবেন না।"

সোমেন নির্বাক চেয়ে থাকে।

আট

কথা ছিল, সোমেনকে রঘুনাথ খবর পাঠাবেন তাঁর ওখানে যাবার জন্য কিন্তু এক হপ্তা কেটে গেল, রঘুনাথের কাছ থেকে কোনো খবর এলো না।

সুদর্শন এসেছে। সোমেনের বাড়ীতে ওঠেনি, দেবাশীষের কাছেই উঠেছে। তিন দিন দেবাশীষের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। কলকাতায় হয়তো যথানিয়মে আসে—সোমেনের সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ পাচ্ছে না।

সেদিন মামাবাবুর ড্রয়ার খুলতে যে লেখাটা সোমেনের হাতে পড়লো, সেটা পড়ে সে বড় কম আশ্চর্য্য হলো না!

লেখাটার তারিখ আছে—যেদিন তিনি খুন হন, এটুকু সেই দিন লেখা। খুব সম্ভব, দুপুরে তিনি চিঠি লিখছিলেন—লেখা শেষ হয়নি! তার কারণ যাকে লিখছিলেন, সেই রঘুনাথ নিজে সন্ধ্যার পর এসেছিলেন তাঁর কাছে।

মামাবাবুর লেখা এ-চিঠি সে পড়লো—

প্রিয় তেওয়ারী সাহেব—আপনি আমাকে আপনার ওখানে যাবার জন্য বলেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে আমি গেলুম না।

আপনাকে চিঠি লিখে জানাচ্ছি—আমার কাছে আপনি যা চান, কিছুতেই আপনাকে আমি তা দেবো না। যতদিন আপনাকে চিনিনি—বিশ্বাস করেছি। কিন্তু অনেক ঠকে আমি বুঝেছি, আপনি মানুষ নন—পিশাচের চেয়েও ভয়ঙ্কর—বেইমান—আপনার অসাধ্য কাজ নেই পৃথিবীতে!

ভয় দেখিয়ে কাজ বাগাবেন—তেমন পাত্র আমি নই। আপনি জানিয়েছেন—আমি যদি এই সব কাগজপত্র আর নক্সা

আপনাকে না দিই, আপনি যেমন করে পারেন, তা আদায় করবেন। আপনার কথায় এমন অনেক কাজ করেছি, যা মনে হলে আমার লজ্জা হয়! বুক কাঁপে! সে কাজের পরিণাম ভেবে আমার বাঁচতে ভরসা হয় না! কিন্তু মনে রাখবেন—আর নয়! আপনার ফাঁদে আর পা দিচ্ছি না। যেমন করে পারি, আপনার কাছ থেকে সরে যেতে চাই! না হলে……

চিঠি এইখানেই শেষ—আর লেখা হয়নি। মনে হয়, এর মধ্যে রঘুনাথ নিজে এসে হাজির হন, তাই শেষ-না-করা চিঠিখানা ড্রয়ারেই রয়ে গেছে!

সোমেন নক্সার জন্য আতি-পাতি খোঁজে। মায়ের মুখেও একদিন কি নক্সার কথা শুনেছিল। কিন্তু সে কিসের নক্সা, মা জানেন না।

কোথায় সে নক্সা?···কোথাও পাওয়া গেল না।

চিঠিখানা পকেটে নিয়ে সোমেন বেরুলো দেবাশীষের সন্ধানে নৈহাটীতে। দেবাশীষ বাড়ীতেই ছিল, বেরুবার জন্য তৈরী হচ্ছিল।

সোমেনকে বসিয়ে দেবাশীষ বললে, "বসো, আমি তোমার কাছেই যাচ্ছিলুম।"

সোমেন বললে, "দু তিনদিন যাওনি, শুধু সেজন্য নয়—মামাবাবুর একখানা চিঠি তাঁর ড্রয়ারে পেয়েছি—এনেছি। সে-চিঠি পড়লে অনেক কিছু বুঝবে।"

চিঠিখানা সে দিলে দেবাশীষকে।

এক নিশ্বাসে দেবাশীষ চিঠিখানা পড়ে ফেললো। তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে! সে বললে, "চিঠি পড়ে তুমি কিছু বুঝেছো?"

সোমেন বললে, "না। আমার মাথায় কিছু আসছে না।"

দেবাশীষ বললে, "তোমার মামাবাবু তেওয়ারী সাহেবকে চিনেছিলেন —তাই তিনি ইদানীং আর তেওয়ারীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখেননি। তবু তেওয়ারী তাঁকে ছাড়ছিল না—বিশেষ যে নক্সার কথাটা রয়েছে, এর জন্যই মামাবাবুকে হাতে রাখা ছিল তেওয়ারীর মতলব। এ নক্সা কি, সুদর্শনের কাছে আমি শুনেছি।"

সোমেন বুঝলো সুদর্শন এসেছে এবং সে এইখানে আছে। সে জিজ্ঞাসা করলে, "সুদর্শন এইখানেই আছে?"

দেবাশীষ বললে, "আর বলো কেন! যেদিন এসেছে, তার পরের দিন থেকে তাকে পাচ্ছি না! স্রেফ নিখোঁজ! বহরমপুরে যেতে পারে, ভেবে সেখানেও খবর নিয়েছি, খবর পেলুম সেখানে সে যায়নি। কলকাতায় তার যে-সব জায়গায় বন্ধু-বান্ধব আছে, সব জায়গায় খোঁজ করেছি, কোথাও তাকে পাওয়া যায়নি। পুলিশে খবর দিয়েছি, প্রত্যেক হসপিটালে খোঁজ করেছি, কোথাও তার এতটুকু খবর মেলেনি।"

সোমেন বললে, "বলো কি? কেউ গায়েব করেছে তাহলে?"

দেবাশীষ বললে, "তা ছাড়া আর কি! রঘুনাথ তেওয়ারীর কাজ! তার বাড়ীতেই সুদর্শনকে মিলবে বলে আমার বিশ্বাস।"

সোমেন বললে, "অর্থাৎ?"

দেবাশীষ বললে, "অর্থাৎ তাকে আটক করে রাখা হয়েছে।"

সোমেন উত্তেজিত হয়ে উঠলো—বললে, "তুমি যখন তাই বুঝেছো, পুলিশের সাহায্য নিয়ে রঘুনাথের বাড়ী সার্চ করে—"

দেবাশীষ বললে, "ধীরে বন্ধু! অত সহজে এ কাজ হবে না। সন্দেহ করছি, প্রমাণ এখনো ঠিক দিতে পারবো না। তার কারণ, তেওয়ারী-সাহেবের আজ সমাজে খুব পশার প্রতিপত্তি! ব্যাটা শয়তান রৈয়স-আদমি বনে' বসে আছে। অগাধ টাকা—টাকার জোরে দুনিয়াকে গোলাম বানানো শক্ত নয় আজকালকার দিনে! শুধু সন্দেহের উপর পুলিশ অমন রৈয়স-আদমির বিরুদ্ধে আঙুল নাড়তে পারবে না। বাড়ী সার্চ করতে হলে সন্দেহের উপর নির্ভরযোগ্য কিছু প্রমাণ চাই। তাছাড়া ও-শয়তান হুঁশিয়ার আছে! সার্চ যদি নিষ্ফল হয়, তাহলে ফ্যাসাদে পড়তে হবে। তার উপর ওর শকুনিমন্ত্রী—মানে, ঐ ব্যাটা ধূর্ত্ত শৃগাল শঙ্করলাল! তার ব্যূহ ভেদ করা সহজ ব্যাপার নয়। সুদর্শন যদি সেখানে থাকে, তাহলে আমরা পুলিশ নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তেওয়ারী তাকে সরিয়ে ফেলবে। তখন আমাদের অবস্থা কি হতে পারে, ভেবে ছাখো।"

হতাশভাবে সোমেন বললে, "হুঁ! তাহলে উপায়!"

তার পিঠ চাপড়ে দেবাশীষ বললে, "উপায়ের জন্যই তোমার কাছে যাচ্ছিলুম। উপায় আমরা আজই করবো। মানে, রাত্রে আমার সঙ্গে আসতে পারবে?"

আশ্চর্য্য হয়ে সোমেন জিজ্ঞাসা করে, "কোথায়?"

দেবাশীষ বললে, "রঘুনাথ তেওয়ারীর বাড়ীতে। রাত্রে যাবে?"

সোমেন যেন অর্থই জলে হাবুডুবু খায়!

গম্ভীর মুখে দেবাশীষ বললে, "অনেক রাত্রে, যখন বাড়ীর সকলে ঘুমিয়ে পড়বে—শুধু অক্ষয় ঘোষ জেগে থাকবে। সে আমাদের দরজা খুলে দেবে—তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে এসেছি। অক্ষয় রাজি। সে

আরও অনেক কথা বলেছে। সে-সব পরে বলবো। যাই হোক, তুমি তৈরী থেকো, রাত বারোটায় আমি তোমার কাছে যাবো! নৌকো আমি ঠিক করে রেখেছি।"

সোমেন বললে, "আমি তৈরী থাকবো! আর তুমিই বা ট্রেনে কলকাতায় যাবে কেন? আমি এখানে থাকি। কিন্তু নৌকোয় করে যাওয়া?"

দেবাশীষ বললে, "নৌকোয় করে যেতে হবে—সামনের দিক দিয়ে যাওয়া নয়—দরোয়ান আর চারটে কুকুর আছে। আমরা গঙ্গার ঘাটে উঠবো—অক্ষয় দরজা খুলে দেবে—কথা আছে। তাহলে তুমি আর দেরী করো না—এখন বাড়ী যাও, সন্ধ্যার আগে সোজা এইখানে এসো।"

সোমেন উঠলো।

তার কাছে সবটা যেন হেঁয়ালি! দেবাশীষ দিন-দিন কেমন দুর্জ্ঞেয় হয়ে উঠছে!

নয়

সন্ধ্যার অনেক আগেই আকাশ কালো মেঘে ভরে এলো।

সন্ধ্যার আগেই সোমেন বেরুলো। মাকে বলে গেল, দেবাশীষের বাড়ী তার নিমন্ত্রণ, রাত্রে ফিরবে না।

দেবাশীষ তৈরী হয়ে ছিল। সোমেন আসতেই সে তাকে নিয়ে ঘাটে চললো।

অন্ধকার পৃথিবী। ঘন কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। অন্ধকারে ঘাটে নৌকো অপেক্ষা করছিল নিঃশব্দে—দেবাশীষ তাতে উঠে বসলো, সোমেন বসলো তার পাশে।

স্রোতের মুখে নৌকো ভেসে চললো—জলের বুকে দাঁড়িদের দাঁড় ফেলার শব্দ।

দেবাশীষ বললে, "বেচারা সুদর্শনের জন্য ভারী ভাবনা হচ্ছে! অত সম্পত্তি যার—আজ তার কিছু নেই! সেই নক্সার কথা মনে আছে? মামাবাবুর কাছে যে নক্সা ছিল? নক্সার কাহিনী সুদর্শনের মুখে যা শুনেছি, বলি, শোনো—

সুদর্শনের পিতা অবনী চৌধুরী এককালে তাঁর বন্ধুর সাহায্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন। দুই বন্ধুতে কথা ছিল, পরস্পরের পুত্র কন্যার বিবাহ দেবেন। শুভ্রার পিতা যেবার ধানবাদে যান, নক্সাটা তখন সেখানে পেয়েছিলেন। সেখানে কোথায় অভ্রের খনি আছে, এ তার নক্সা। নক্সা নিয়ে ফিরে এসে তিনি সেটা দেন অবনী চৌধুরীকে। এরপর শুভ্রার বাবা হঠাৎ ট্রেণ-অ্যাক্সিডেণ্টে মারা যান এবং অবনী চৌধুরী তার দিন পনেরো পরে কলেরায় মারা যান। আজ মনে হয়, ট্রেণ-অ্যাক্সিডেণ্ট এবং অবনী চৌধুরীর আকস্মিক মৃত্যু—এর মূলে ছিলেন সুদর্শনের কাকা মোহিনী চৌধুরী। মোহিনীর বন্ধু এই রঘুনাথ —রঘুনাথের সঙ্গে চক্রান্ত করে শুভ্রার বাবাকে খুন করা হয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস। তারপর প্রচার করেন—অ্যাক্সিডেণ্টে মৃত্যু হয়েছে। তারপর অবনী চৌধুরী হঠাৎ মারা গেলেন—এতেও ঐ দুই গুণধরের হাত ছিল, নিশ্চয়।"

যে জন্য এত কাণ্ড ঘটলো, সেই নক্শা কি করে সোমেনের মামা

আশুবাবুর হাতে গিয়ে উঠলো, সুদর্শন বা দেবাশীষ বুঝতে পারে না। আশুবাবু এত কাল ও-নক্‌শা গোপনে রেখেছিলেন, সম্প্রতি সুদর্শনের সঙ্গে দেখা করে নক্‌শার নির্দ্দেশমত খনি আবিষ্কারের চেষ্টাও করছিলেন, আর ঠিক সেই সময়ে তিনি হলেন খুন!

রূপকথার গল্প যেন! কোথায় সেই অভ্রের খনি-রূপ রাজকন্যা ঘুমিয়ে আছে—কোন্ রাজকুমার হাতের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে রাজকন্যাকে জাগিয়ে তুলবে!

তরতর করে নৌকো বয়ে চলেছে!

আকাশের বুক চিরে এদিক থেকে ওদিক পর্য্যন্ত বিদ্যুতের চমক—সে আলোয় গঙ্গার বুক অনেকখানি দেখা যায়।

আজকের এই আকাশের দিকে তাকিয়ে দেবাশীষ খুশী হয়ে উঠেছে!

সোমেন বললে, "কিন্তু রঘুনাথের বাড়ীতে কোথায় কোন্ ঘর, তা জানি না। সুদর্শনকে যদি নিজের বাড়ীতে আটকে রেখে থাকে, আমরা কি করে সন্ধান পাবো?"

দেবাশীষ বললে, "অক্ষয় আছে, সে সব জানে!"

সোমেন কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর জিজ্ঞাসা করলো, "সুদর্শনের সঙ্গে যে মেয়েটির বিবাহের কথা হয়েছিল, সে এখন কোথায় আছে, জানো?"

দেবাশীষ বললে, "না, সুদর্শন তার কোন খবর পায়নি। শুভ্রা তার বাপের কাছে মাঝে মাঝে আসতো। সেখানে সে থাকতো না। শুনলুম, পিসির কাছে বম্বেতে থাকতো। সেখানে সে পড়তো—বি, এ পাশ করেছিল। তাদের বিবাহের দিন পর্য্যন্ত ঠিক হয়ে গিয়েছিল এবং শুভ্রার পিসিমা তাকে নিয়ে এসেছিলেন বালিগঞ্জে তাঁর নিজের বাড়ীতে।

এই সব ব্যাপার হলো বলে বিবাহ স্থগিত রইলো। তারপর সে মেয়ে কোথায় গেল, কেউ তা জানে না। যাবার আগে পিসিমাকে লিখে গেছে—সে জানতে পেরেছে তার বাবাকে কৌশলে খুন করা হয়েছে। খুনীকে সে যেমন করে হোক বার করবেই আর খুনী যাতে সাজা পায়, সে ব্যবস্থাও করবে।

সুদর্শনকেও একখানা চিঠি দিয়েছে—লিখেছে—খুনীর সন্ধান সে পেয়েছে—সুদর্শনের চিন্তার কারণ নেই। এদের একটা দল আছে—দলকে সে একেবারে প্রমাণ সমেত ধরিয়ে দেবে! সুদর্শনের যা গেছে, উদ্ধার করতে পারবে!"

দেবাশীষ বললে, "কিন্তু সুদর্শনের বিশ্বাস—শুভ্রা যা বলেছে তা সে করবেই, করবার ক্ষমতা তার আছে! সুদর্শন শুভ্রাকে চেনে, শুভ্রাকে সে খুব বিশ্বাস করে—সব দিক দিয়ে। সুদর্শন জোর করে বলেছে, শুভ্রা মুখে যা বলে, কাজে তা না করে ছাড়ে না।"

আকাশের বুক চিরে আবার বিদ্যুতের ঝলকানি—সে আলোয় দেখা যায় বেলুড়! বাঁ-দিকে রঘুনাথের প্রকাণ্ড অট্টালিকা—পাঁচিলেঘেরা—গঙ্গার ঘাট—উপরকার—দরজাও দেখা গেল।

সোমেন বললে, "আমরা যে নামবো—নৌকো ফিরে যাবে না?"

দেবাশীষ বললে, "না, নৌকো আমি আজকের মত নিয়েছি—যার নৌকো, সে আমার বিশেষ জানা লোক। নৌকো যে এনেছে, সে নিজে আর আমার পুরানো চাকর মঙ্গল আমরা যতক্ষণ না ফিরবো, ঘাটের পাশে নৌকো রাখবে এরা।"

নিঃশব্দে ঘাটে নৌকো লাগলো, দেবাশীষ আর সোমেন ঘাটে নামলো।

অন্ধকার রাত—সুবিধা হয়েছে!

দেবাশীষ চুপি চুপি কথা বলে। হাতের রেডিয়াম-ঘড়ির পানে তাকিয়ে দেখলো—এগারোটা বেজেছে। অক্ষয়ের সঙ্গে কথা, ঠিক রাত এগারোটার সময় দরজায় টোকা দেবে, অক্ষয় দরজা খুলে দেবে।

পায়ে রবারের জুতো পরে এসেছে, নৌকোয় উঠে সোমেনকেও জুতো ছাড়িয়ে রবারের জুতো পরিয়েছে।

উত্তেজনায় সোমেনের সারা দেহে রোমাঞ্চ! আজ রাত্রে দেবাশীষ একটা কিছু করবে এবং সে জন্য তাকে সে করেছে সঙ্গী। ভাবতেও গর্ব্ববোধ করছিল।

পকেট থেকে অন্ধকারেই একটা অটোমেটিক রিভলভার বার করে সোমেনের হাতে দিয়ে দেবাশীষ বললে, "এটা তোমার কাছে রাখো, কাজে লাগবে। রিভলভার ছুঁড়তে পারো জানি, তাই তোমার জন্যও একটা নিয়ে এসেছি।"

পকেটে টর্চ্চ থাকলেও অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছিল, তার পিছনে সাবধানে পা ফেলে চলেছে সোমেন।

ছোট দরজা! ভিতর থেকে বন্ধ—দেবাশীষ আস্তে আস্তে তিন বার টোকা দিলে।

দরজা ভিতর থেকে আস্তে আস্তে খুলে গেল! দেবাশীষ ফিস্‌ফিস্ করে ডাকলো, "অক্ষয়!"

তেমনই মৃদু কণ্ঠে অক্ষয় বললে, "হ্যাঁ, আসুন! সব শুয়ে পড়েছে। কেউ জেগে নেই।"

দেবাশীষ জিজ্ঞাসা করলে, "কুকুরগুলো?"

অক্ষয় বললে, "তারাও ঘুমোচ্ছে, অন্ততঃ তিন চার ঘণ্টার আগে তাদের ঘুম ভাঙ্গবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

দেবাশীষ এবং সোমেন বাগানে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিলে।

অক্ষয় সোজা চলেছে···নিকষ-কালো অন্ধকারে দু'হাত তফাতে তাকে দেখা যাচ্ছে না! আন্দাজে তার পায়ের শব্দ অনুভব করে দেবাশীষ চলেছে তার পিছনে।

দশ

নিঃশব্দে তিনজনে এলো ছোট ঘরে।

একটা দিয়াশলাই জ্বেলে অক্ষয় চৌকি দেখিয়ে বললে, "আপনারা খানিক বসুন, বারোটায় চীনে দরোয়ান একবার রোঁদ দিতে বেরোয়, তারপর সে আবার নিজের জায়গায় ফিরে যায়। সে আর খানিক পরেই ঘুরতে বেরুবে। ফিরে গেলে আমি ও-দিক্‌টায় নিয়ে যাবো।"

দেবাশীষ আর সোমেন বসলো।

দেবাশীষ বললে, "তারপর ও-দিককার আর খবর কি? আর কিছু জানতে পারলে?"

অক্ষয় বললে, "কিছু কিছু জেনেছি বাবু। তেওয়ারী-সাহেব সে ছেলেটিকে পিছনের বাড়ীতে একটা ঘরে আটকে রেখেছেন। এদিকে কাল থেকে শান্তা-মাকেও আর দেখতে পাইনি।"

বিস্মিত হয়ে দেবাশীষ বললে, "তার মানে? তোমার শান্তা-মা গেলেন কোথায়?"

অক্ষয় বললে, "এ শঙ্করলালের কাজ। মোক্ষদা বলে—শঙ্করলাল যে দু'জন ঝি দিয়েছে দিদিমণির কাছে—তাদের কাজ ছিল পাহারা দেওয়া। সেদিন এদিকে বেড়াতে এসে শান্তা-মা মোক্ষদার সঙ্গে অনেক গল্প করেছিলেন, আমাকেও কত কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"

বলতে বলতে সে থামলো—তারপর বললে, "শান্তা-মা চমৎকার বাংলা বলতে পারেন বাবু। আমি তাই জিজ্ঞাসা করেছিলুম—আপনি কক্‌খনো হিন্দুস্থানী মেয়ে নন, নিশ্চয় বাঙ্গালী, তাতে শান্তা-মা হেসেছিলেন। শান্তা-মা তারপর আর একদিন আসছিলেন, কিন্তু শঙ্করলাল এসে বাধা দিলে।"

সোমেন বললে, "অনেক হিন্দুস্থানীই খুব ভালো বাংলা বলতে পারেন। শান্তা দেবী বাংলা শিখেছেন, তাতে সন্দেহ নেই।"

দেবাশীষ বললে, "শান্তা দেবীকে আমি একদিন দেখেই চিনেছি। সুদর্শনের কাছে আমি শুভ্রার ফটো দেখেছি, তার সঙ্গে শান্তা দেবীর চেহারার কোনো তফাৎ নেই।"

সোমেন আশ্চর্য্য হলো, বললে, "তুমি বলতে চাও শুভ্রাই শান্তা নাম নিয়ে পরম শত্রুদের মাঝখানে বাস করছেন?"

দেবাশীষ বললে, "আশ্চর্য্য হলেও অবিশ্বাস্য নয় সোমেন। তুমি আর আমি কদিন আগে এই বাড়ীতেই শুভ্রা দেবীকে দেখেছি। তুমি লক্ষ্য করোনি, কিন্তু আমি করেছি—হঠাৎ ঘরে ঢুকেই দু'জন বাঙ্গালীকে দেখে চমকে উঠেছিল! তখনই নিজেকে সামলে নিয়ে তেওয়ারী-সাহেবের কাছ থেকে টাইপ-করা কাগজটায় নাম সহি করিয়ে নিয়ে গেল। মনে করো না, সেদিন আমি কেবল বেড়াতে বা তেওয়ারী-সাহেবকে দেখতে

এসেছিলুম! আমি এসেই লক্ষ্য করেছি ওই লাল ফুলগুলো, ঐ নির্জ্জীব দুটি সাপ এবং শান্তা দেবীকে।"

"উ—উ—উ—উ—"

অস্বাভাবিক চীৎকার ভেসে আসে।

অক্ষয় সচকিত হলো, "চুপ, বাবু! লিংচু টহল দিতে বেরিয়েছে।"

অন্ধকারে ছোট ঘরটায় তিনজনে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে।

ভারী বুটের শব্দ কাছে আসে—জানলার ফাঁক দিয়ে টর্চ্চের চকিত আলোর ঝলকানি দেখা যায়। লিংচু এধার ছাড়িয়ে অন্যদিকে যায়।

"শিট্ট, স্যাণ্ডো, ইয়াল্লি, মালাও—"

অক্ষয় চুপি চুপি বলে, "কুকুরগুলোর সাড়া না পেয়ে লিংচু ওদের নাম ধরে ডাকছে। এখনি না একটা গোলমাল হয়!"

আর কোনো শব্দ পাওয়া যায় না, লিংচু এই মেঘাবৃত অন্ধকার রাত্রে নিজের কর্ত্তব্য পালন করে ফিরে গেল, মনে হলো।

দেবাশীষ জিজ্ঞাসা করলে, "এই লিংচুকে তোমার মনিব কবে আনলেন? আগে তো ছিল না।"

অক্ষয় বললে, "ওকে এনেছে শঙ্করলাল। লিংচু নাকি সাপের ওঝা, যে-কোনো সাপকে ও এমন বশ করতে পারে, যা আমাদের দেশে কেউ পারে না। ওর অনেক গুণ আছে বাবু, ওই লাল ফুল থেকে ও কিভাবে রস বার করে, তা দিয়ে নাকি সাপের ওষুধ তৈরী হয়। লোকটা অন্য দিক দিয়ে ভারী শয়তান। ওর মুখ দেখলে মনে হয়—পৃথিবীতে এমন কাজ নেই যা ও করতে পারে না। শান্তা-মা ও লোকটাকে ভয়ানক ভয় করেন, দেখেছি।"

এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে আস্তে আস্তে সে দরজা খোলে, বাইরে মুখ

বাড়িয়ে চারিদিক দেখে নেয়। কোনো ঘরে আলো জ্বলছে না। মনে হয়, সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে।

নিঃশব্দে বেরুলো দেবাশীষ, সোমেনকে সঙ্গে নিলে না, বললে, "তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি অক্ষয়ের সঙ্গে যাচ্ছি। দরকার হলে শীষ দেবো, তুমি যাবে। যদি শীষ শুনতে না পাও, তুমি আস্তে আস্তে বেরিয়ে নৌকোয় গিয়ে বসবে—ভোর পর্য্যন্ত আমার জন্য অপেক্ষা করো।"

বেরুবামাত্র ওরা অন্ধকারে মিশে গেল। অক্ষয়ের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সোমেন একা।

বাগানের একপাশে নূতন তিনতলা কখানা বাড়ী—আগে ছিল না, তিন চার বছর হলো তৈরী হয়েছে।

অক্ষয়ের সঙ্গে দেবাশীষ চলেছে। প্রকাণ্ড লম্বা বারান্দায় এসে অক্ষয় বললে, "এ ঘরটায় চাবি দেওয়া আছে বাবু। এ রকম ক'টা ঘর পার হয়ে গেলে মাঝখানে যে-ঘরটি পাওয়া যাবে, খুব সম্ভব সেই ঘরে ছেলেটিকে রাখা হয়েছে। সে ঘর থেকে হাজার চীৎকার করলেও ঐদিককার কেউ তা শুনতে পাবে না—এমন কায়দা করে সে ঘর তৈরী।"

পকেট থেকে চাবির গোছা বার করে দেবাশীষ বললে, "সন্ধান যখন পেয়েছি, সহজে ছাড়বো না অক্ষয়। আমি চাবি এনেছি। নেহাৎ না লাগে, তালা ভাঙ্গবার জন্য যন্ত্রও এনেছি, দেখি, খোলা যায় কি না!"

টর্চ্চের আলোয় তালায় চাবি লাগালো।

চাবি উপর্য্যুপরি লাগাবার পর একটা চাবিতে তালা খুললো।

কম্পিত বক্ষে অক্ষয় ঘরে ঢোকে, তার পিছনে দেবাশীষ। টর্চ্চের মুখে হাত চাপা দিয়ে মৃদু আলোয় ঘরের পর ঘর পার হয়।

রাতের অন্ধকারের মধ্যে খানিক আলোয় ঘরগুলি আবছা দেখা

গেলেও ঘরগুলোর ভীষণতা দেবাশীষ উপলব্ধি করে। কোনো রকমে যদি জানতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে সে আর তার সঙ্গে যে-লোক এ ঘরে আছে, তাকে নিয়ে সরতে হবে। তাই যত-শীঘ্র সম্ভব, কাজ সারা চাই।

চার-পাঁচটি ঘর পার হয়ে আবার তালাবন্ধ যে ঘর, সে-ঘর দেখিয়ে অক্ষয় বললে, "এই ঘরে সে ছেলেটিকে রাখা হয়েছে বাবু, আমি রোজ লিংচুর সঙ্গে আসি তাকে ভাত দিতে। লিংচু দরজা খুলে দিয়ে দাঁড়ায়, আমি তাকে খেতে দিই। খাওয়া হয়ে গেলে বাসন নিয়ে বেরিয়ে যাই—লিংচু দরজা বন্ধ করে দেয়।"

ক্ষিপ্র হস্তে দেবাশীষ তালায় চাবি লাগায়, পাঁচ-সাতটার পর একটা চাবিতে দরজা খুলে যায়। ধাক্কা দিয়ে দরজা খোলবার সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে প্রশ্ন, "কে? রাত্রেও নিশ্চিন্তে ঘুমোতে দেবে না শঙ্করলাল?"

"চুপ! শঙ্করলাল নই, দেবাশীষ। অনেক কষ্টে সন্ধান পেয়ে এসেছি।

সঙ্গে সঙ্গে দেবাশীষ টর্চ্চ জ্বালে।

"দেবাশীষ!"

বন্দী-সুদর্শন ছুটে আসে, দু'হাত দিয়ে দেবাশীষকে জড়িয়ে ধরে।

টর্চ্চের আলোয় দেবাশীষ দেখে সুদর্শনকে। মাত্র দিন দশ-বারো কাছ-ছাড়া, এই কদিনেই সুদর্শন কী রোগা হয়ে গেছে! মাথার চুল রুক্ষ—চোখের কোলে কালি। পরণে হাফপ্যাণ্ট আছে। একটা গেঞ্জি মাত্র আচ্ছাদন, পা একেবারে খালি।

রুদ্ধশ্বাসে সুদর্শন জিজ্ঞাসা করলে, "কি করে আমার সন্ধান পেলে? কি করে জানলে এরা আমায় এখানে আটকে রেখেছে? এমন জায়গা

যে একটা মাছি পর্য্যন্ত আসতে পারে না! এ-রকম জায়গায় এই রাত্রে তুমি কি করে এলে, ভাবছি।"

দেবাশীষ বললে, "ভগবানের ইচ্ছা। কিন্তু আর একমুহূর্ত্ত দেরী নয়, এখনই বেরিয়ে এসো। ঘাটে নৌকো আছে, বারান্দায় সোমেন অপেক্ষা করছে, তাড়াতাড়ি চলে এসো।"

অন্ধকার ঘরে টর্চ্চ জ্বেলে চলে দেবাশীষ, তার পিছনে সুদর্শন এবং অক্ষয়।

বাইরে বেরিয়ে দরজায় চাবি দিতে দিতে মৃদু হেসে দেবাশীষ বললে, "কাল সকালে দরজায় চাবি বন্ধ দেখে এরা জানবে বন্দী ঠিক আছে। গঙ্গার ধারের দরজাও বন্ধ করে দেবে। স্বপ্নেও কেউ জানতে পারবে না অক্ষয়, আমি চোরের উপরে বাটপাড়ি করেছি!"

পিছনে ফিরেই তিনজনে স্তম্ভিত!

দপ করে জ্বলে ওঠে চারটে টর্চ্চের আলো! সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কর-লালের গর্জ্জন—"হাত তুলে দাঁড়াও—জলদি হাত তোলো দেবাশীষবাবু, নাহলে এই ছাখো, আমাদের হাতে কি!"

চোখের সামনে চার হাতে চারটে রিভলভার—আলোয় ঝকমক ক'রে ওঠে!

পকেটে হাত দেওয়ার অবকাশ পাওয়া যায় না, বাধ্য হয়ে মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়াতে হয়।

লিংচুর মুখ দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে শোনা যায় তার হাসি—"হা-হা-হা-হা—"

চারটি উদ্যত রিভলভারের সামনে অক্ষয়, দেবাশীষ এবং সুদর্শনের হাতে শিকল পরানো হয়।

শঙ্করলাল হুকুম দেয়, "ভিতরের দিকে তিন ঘরে তিনজনকে রাখো। কাল সকালে কর্ত্তা নিজে এসে দেখবেন।"

তারপর সে দেবাশীষের পানে তাকায়, মৃদু হেসে বলে, "তোমার সাহস খুব দেবাশীষবাবু, বাঘের মুখে এসেছো—ভাবোনি বাঘ কোনো দিন ঘুমোয় না। শান্তাকে চমৎকার করে সাজিয়ে এখানে পাঠিয়েছিলে—ভেবেছিলে, তাকে আমরা সন্দেহ করবো না! বেপরোয়া ভাবে সে কাজ করেছে—অনেক খবর সংগ্রহ করে দলিল-পত্র নিয়ে কাল পালিয়েছে। নিশ্চয় তোমার কাছে খবর দিয়েছে তাই তুমি এসেছো, আমি জানি। আর এই অক্ষয়—"

বৃদ্ধ অক্ষয় তখন থরথর করে কাঁপছে

শঙ্করলাল গর্জ্জন করে, "তোমায় আমি কুকুর দিয়ে খাওয়াবো, জীবন্ত সাপ দিয়ে খাওয়াবো···হতভাগা বেইমান। এই জন্যই বাঙ্গালীকে আমি বিশ্বাস করিনে। বাঙ্গালীকে বিশ্বাস করে বহুবার ঠকেছি। বুড়ো মানুষ বলে তোমায় বিশ্বাস করেছিলুম, সে বিশ্বাসের খুব দাম দেছ! এই বেইমানীর সাজা যা পাবে···হাড়ে হাড়ে বুঝবে!"

অক্ষয়ের মুখে একটি কথা নেই। বলিদানের পাঁঠার মত সে কাঁপছে।

লিংচু দরজা খুললো···দুজন ভীম মূর্ত্তি চীনাম্যান বন্দীদের টানতে টানতে ভিতরে নিয়ে গেল।

খুব সম্ভব সোমেন সরে গেছে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে দেবাশীষ! যাক, সোমেন সব জানে, সে যা হয় করবে! তা ছাড়া শান্তা এদের উপর বাটপাড়ি করে পালিয়েছে! চুপ করে থাকবার মেয়ে সে নয়···ঠিক হবে!

অন্ধকার নির্জ্জন ঘরে ঠাণ্ডা কনকনে মেঝেয় বসে বন্দী দেবাশীষ!

এগারো

ভোর হবামাত্র সোমেন এলো থানায়···নীরেন দত্ত তখন সবে ঘুম ভেঙ্গে উঠেছেন।

সোমেনকে দেখে তিনি হাসলেন, বললেন, "সোমেন বাবু যে, কি খবর? কাল রাত্রে গঙ্গার বুকে হাওয়া খেয়ে শরীর অসুস্থ হয়নি তাহলে!"

সোমেন বললে, "কাল রাত্রে গঙ্গার হাওয়া খেয়েছি, আপনি কি করে জানলেন?"

নীরেন দত্তর ঠোঁটে কৌতুকের হাসি! তিনি বললেন, "পুলিশের চোখ এড়ানো সহজ নয় মশায়! তারপর—দেবাশীষবাবু নিশ্চয় কোনো সন্ধান পেয়েছেন, তাই আপনাকে কাল রাত্রে নিয়ে গিয়েছিলেন।"

সোমেন বললে, "আপনি দেখছি সবই জানেন! তাহলে এটুকুও জানেন, দেবাশীষ ফেরেনি, আমি একা ফিরেছি!"

নীরেন দত্ত বললেন, "সেই জন্যই ভোর না হতে আমার সন্ধানে এসেছেন! দেখুন, আমি আপনার বলবার আগেই সব জানতে পেরেছি।"

বলতে বলতে তিনি হেসে উঠলেন।

বললেন, "দেবাশীষবাবু যে দুজন দাঁড়ি মাঝি নিয়ে গিয়েছিলেন, তাদেরই একজন এসে সব জানিয়ে গেছে। তাকে দু-একবার আমি ডাকাতি কেসে বাঁচিয়েছিলুম কিনা—তাই সে খুব বাধ্য আমার। বাড়ীটা

রঘুনাথ তেওয়ারীর, সে কথাও সে বলেছে। আসল কথা, তেওয়ারীর উপর তার ভয়ানক আক্রোশ, সেই জন্যই তেওয়ারীর সব খবর সে রাখে। ব্যাপারটা কি বলুন তো, শুনি।"

সোমেন ঘটনাটা আনুপূর্ব্বিক শোনালো। নীরেন দত্ত নিমের ডালের দাঁতন করতে করতে শুনছিলেন, মাঝে মাঝে মুখখানা শুধু গম্ভীর হয়ে উঠছিল।

দাঁত মাজা শেষ করে তিনি বললেন, "কিন্তু যে-মেয়েটির কথা বললেন, একে এখন দেখলে চিনতে পারবেন?"

সোমেন বললে, "নিশ্চয় পারবো। তার কারণ, আমি তাঁকে দেখেছি, এবং ভালো করেই দেখেছি।"

নীরেন দত্ত গম্ভীর মুখে বললেন, "কিন্তু তিনি ওখান থেকে পালালেন কেন? মনে হয়, শঙ্করলাল তাঁর উপর নিশ্চয় কোনো দুর্ব্যবহার করেছিল!"

সোমেন বললে, "হতে পারে।"

নীরেন দত্ত ঘাড় দুলোলেন, বললেন, "সব তো শুনলুম। বুঝছি না শুধু আপনার এমন চিন্তিত হয়ে এখানে আসবার কারণ। দেবাশীষবাবুর জন্যই এসেছেন—বোধ হয়?"

সোমেন বললে, "সে তো বুঝেছেন! সুদর্শনের সন্ধানে দেবাশীষ আমাকে নিয়ে রঘুনাথ তেওয়ারীর বাড়ীতে গিয়েছিল। আমি দূর থেকে দেখেছি, শঙ্করলাল কজন লোক নিয়ে ওদের ধরে আটক করেছে। মনে হয়, সে-জায়গা আপনাকে দেখিয়ে দিতে পারবো। আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। দেরী করলে ওরা হয়তো সুদর্শন আর দেবাশীষকে ওখান থেকে সরিয়ে ফেলবে।"

নীরেন দত্ত বললেন, "আমি রাজি। কিন্তু কথা হলো জুরিসডিকসন নিয়ে! মানে, আমার থানার হুদ্দোর বাইরে ঘটনা ঘটেছে—তবু মানে, এ-থানার কেস-এর সংশ্লিষ্ট বলে আপনার নালিশ লিখে তার উপর ডেপুটি কমিশনারের অর্ডার করিয়ে নিতে হবে আমাকে। তাতে কিঞ্চিৎ সময় লাগবে। তবু যত শীগগির সে-অর্ডার পাই—আই শ্যাল শী! আপাততঃ আমি কজন পুলিশ দিচ্ছি—আর্মড্ পুলিশ—এরা গিয়ে বাড়ীর চারিদিক ঘিরে পাহারা দেবে—আমিও ইতিমধ্যে ডেপুটি-সাহেবের অর্ডার নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারি, গিয়ে হাজির হবো, এ্যাণ্ড টেক্ প্রপার এ্যাকসন!"

নিশ্চিন্ত হয়ে সোমেন এলো বাড়ীতে।

এসেই তাকে ছুটতে হলো মেডিকেল কলেজে—চাকরির দায়।

সোমেন কাজ সেরে ফেরবার সময় ডাক্তার দে খবর দিলেন—একটি মেয়ে-পেসেণ্ট সকালে হসপিটালে এসেছে। অজ্ঞান অবস্থায় এসেছিল। এখন জ্ঞান হয়েছে এবং ডাক্তার সোমেনকে খোঁজ করছে—সোমেনবাবুর আত্মীয়া হন নাকি।

"আমার আত্মীয়া!"

সোমেন ভাবতে থাকে। তার কে এমন আছে, হসপিটালে এসে খোঁজ করবে! দে'র সঙ্গে সে চললো জেনারেল ওয়ার্ডে।

ফিমেল ওয়ার্ডে এক বেডে মেয়েটি চোখ বুজে পড়ে আছে। তার পানে তাকিয়ে সোমেন চমকে উঠে! আশ্চর্য্য! শান্তা! এখানে এ অবস্থায় ওকে দেখবার কল্পনা সে করেনি! আত্মীয়া বলে পরিচয় দিলেও সে বুঝতে পারেনি! দেখে তার চমক লাগলো।

তবু বুঝতে পারে না—শান্তা তাকে ডেকেছে কি দরকারে? যে-

শান্তাকে সে কাল থেকে খুঁজছে, তাকে এখানে এ-অবস্থায় পাবে, এ স্বপ্নের অগোচর।

শুনলো, আজ ভোরে দুজন কনষ্টেবল মেয়েটিকে কলেজ-স্কোয়ারে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে; তারা হসপিটালে ফোন করে এ্যাম্বুলেন্স আনিয়ে তাতে তাকে তুলে কলেজে পৌঁছে দিয়েছে।

জ্ঞান হয়েছে খানিক আগে। জ্ঞান হয়ে যখন জানলো, মেডিকেল কলেজে এসেছে, তখন সোমেনের খোঁজ করেছে।

দে বললেন, "এখন ওঁকে না ডাকাই উচিত। ঘুমোচ্ছেন। বিকেল নাগাদ অনেকটা সুস্থ হবেন, আশা করা যায়—তখন এসে দেখা করবেন। কেমন?"

সোমেন বললে, "সেই ঠিক হবে।"

এ কথা বলে সোমেন কলেজ থেকে বেরুলো।

কাল রাত্রে সে শুনেছে—রঘুনাথ তেওয়ারীর অত্যন্ত দরকারী কি সব দলিল-পত্র নিয়ে দু-তিন দিন আগে শান্তা নিরুদ্দেশ! এই দু-তিন দিন তাকে ধরে আনবার জন্য না হয়, তাকে খুন করে সে দলিল-পত্র আনবার জন্য শঙ্করলাল লোক লাগিয়েছে। এ-কথাও সোমেন শুনেছে।

কিন্তু আজ শেষ রাত্রে হঠাৎ কলেজ-স্কোয়ারে শান্তা কি করে এলো?

সোমেন ঠিক করতে পারে না।

শান্তার সম্পূর্ণ জ্ঞান হলে তাকে ভালো করে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। এখন ওকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত হবে না। ব্যাকুল হলেও অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই!

বারো

অন্ধকার ঘরে বন্দী দেবাশীষ।

কখন দিন কখন রাত—বুঝতে পারে না! কাল রাত্রে টানতে টানতে তাকে এনে এ ঘরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে লিংচু। সেই অট্টহাসি আর সেলাম করে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে সে বলে গেছে, "নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও এখানে। দিনে দুবার খাবার দেবার সময় ছাড়া আর কেউ তোমায় বিরক্ত করতে আসবে না।"

রাতটা কোথা দিয়ে কেটে গেল—কখন সকাল হলো, জানে না। মনে হয়, ঘরের ভিতরে জমাট অন্ধকার একটু হালকা হয়ে এসেছে—তাই থেকে বোঝে দিনের বেলা।

অনেক উপরে ঘুলঘুলি দিয়ে একটু আলোর চমক দেখা যায়। দেবাশীষ চেয়ে দেখে—তিনদিকে ইটের দেওয়াল, একদিকে কাঠের পার্টিশন। মনে হয়, লম্বা হল, মাঝে মাঝে কাঠের পার্টিশন করে ছোট ছোট খুপরী করে নেওয়া হয়েছে।

ইটের দেওয়ালের মাঝে একটি দরজা। দরজা বাইরে থেকে বন্ধ।

এক-সময় ও দরজা খুলে যায়, পাতলা অন্ধকারে দীর্ঘ এক মূর্ত্তি খাবার নিয়ে আসে।

দেবাশীষ একবার শুধু তাকিয়ে দেখে। উদরে ক্ষুধা, বেশীক্ষণ অগ্রাহ্য করে থাকা যায় না—খেতে বসে।

মূর্ত্তির হাতের টর্চ্চের আলো ছড়িয়ে পড়ে খাবারের উপর! সে-আলোয় দেবাশীষ দেখে তার খাবারের চেহারা।

লাল মোটা চালের ভাত, মাঝখানে গর্ত্ত করে ডাল ঢালা। এক-পাশে তরকারী আর ভাজা, একটুকরো মাছও যেন আছে মনে হয়।

টর্চ্চের আলোয় কাঠের পার্টিশনটা দেখবার সুযোগ মেলে। এক-একটুকরো লম্বা তক্তা জোড়া দিয়ে পার্টিশন তৈরী হয়েছে, এবং উপরের দিকে ফাঁক নেই।

ক্ষুধার মুখে এই খাবারই মনে হয়, অমৃত!

দীর্ঘ কালো মূর্ত্তি থালা নিয়ে যেমন নির্বাক এসেছিল, তেমনি নির্বাক ভাবেই থালা নিয়ে বেরিয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে দরজা হলো বন্ধ।

কাঠের গায়ে দেবাশীষ ঘা মারে, ওপার থেকে ওঠে প্রতিধ্বনি। কাঠের সরু ফাঁকে মুখ রেখে দেবাশীষ জিজ্ঞাসা করে, "ওদিকে কে? সুদর্শন?"

সুদর্শনের কণ্ঠ শোনা যায়—হ্যাঁ, আমি আর অক্ষয়—দুজনে আছি। তুমি পাশের কামরায়—ভালো হলো।"

ভালো হলো! দেবাশীষের মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে ওঠে, "ভালো কি করে? মাঝে পাঁচিল—সাগরের আড়াল যেন! এক হবার উপায় কি?"

তার কথা বলার ভঙ্গীতে সুদর্শন হেসে ওঠে। সকাল থেকে সে ভয়ানক মুষড়ে পড়েছিল—ভাতের শুধু কটা দানা মুখে দেছে—দেবাশীষের মত সব খেতে পারেনি। অক্ষয় একেবারে ওঠেনি—কাল রাত্রে সেই যে শুয়েছে, ওঠবার নাম নেই তার! একটা বোবা লোক ভাত নিয়ে এসেছিল, আঁউ-আঁউ করে চেঁচিয়েছে—শেষে অক্ষয়কে পা দিয়ে ঠেলা দিয়েছে, তখন অক্ষয় ক্লান্ত কণ্ঠে জানিয়েছে, সে খাবে না। তার জ্বর।

এতদূর পর্য্যন্ত বলে সুদর্শন একটু চুপ করে থাকে, তারপর ব্যাকুল কণ্ঠে বলে, "এখন উপায়? কি করে বেরুনো যায়? এতদিন তবু আশা ছিল, তুমি আছো—যেমন করে হোক, কিছু করবে। এখন?"

কাঠের সরু ফাঁকে কান পেতে দেবাশীষ তার কথা শোনে, জবাব দেয়, "ভাবনা করো না, সোমেন সব দেখে গেছে। আজ সকাল থেকে চেষ্টা সে করবেই।"

কাঠখানা সরাবার জন্য চেষ্টা করে দুদিক থেকে দুজনে—সিমেণ্টে গাঁথা পাতলা তক্তা এতটুকু নড়ে না! দুদিকে দুজনে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। দেবাশীষ হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, "আজ এই পর্য্যন্ত! কাল আবার দেখা যাবে। এ তক্তা আমি খুলবোই।"

খড়ের বিছানায় শুয়ে পড়ে সে।

অকস্মাৎ আর্ত্ত চীৎকার কানে আসে, "তোমার পায়ে পড়ি,···আমায় নিয়ে যেয়ো না—আমায় এখানে আটক করে রাখো। আর ক'দিন বা বাঁচবো। সে ক'টা দিন—"

অক্ষয়ের আর্ত্তনাদ! হয়তো তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে শঙ্করলালের লোকেরা—নিশ্চয় মেরে ফেলবে।

উত্তেজিত হয়ে ওঠে দেবাশীষ—কিন্তু কি করতে পারে সে? কাঠের পার্টিশনটা যদি সরাতে পারতো কোনো রকমে, তাহলেও যা হোক কিছু চেষ্টা···

লিংচুর জলদ গর্জ্জন শোনা গেল—সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয় নীরব।

ওদিককার দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

দেবাশীষ তক্তার ফাঁকে মুখ রেখে ডাকে, "সুদর্শন···"

ক্ষীণ কণ্ঠে সাড়া পায়, "আছি। অক্ষয়কে নিয়ে গেল। ইনজেকশন দেবে!"

"ইনজেকশন! কিসের ইনজেকশন?"

সুদর্শন তক্তার দিকে সরে আসে, বলে, "সাপের বিষ দিয়ে কি একটা তৈরী করেছে। শুনেছি সোমেনের মামাবাবুকে ইনজেকশন দিয়ে মেরেছে। অক্ষয়কেও তাই দেবে—মনে হয়।"

দেবাশীষ বলে, "অক্ষয়কে সে ইনজেকশন দেবে না। বড় কষ্টে তৈরী সে জিনিষ আমার জন্য তৈরী করেছে! বিশেষ ক্ষেত্রে ওরা সে ইনজেকশন দেয়। অক্ষয়ের পক্ষে গুলি বা ছোরাই যথেষ্ট। এখন ও-কথা ছেড়ে দাও। আমার কথা শোনো।"

ঠিক হয়, যেমন করে হোক, একখানা তক্তা সরাতে হবে। তারপর সেই ফাঁকে পালানো—তেমন মুস্কিল হবে না, মনে হয়!

সুদর্শন বলে, "তোমার মাথা খারাপ হয়েছে! একখানা তক্তা না হয় খোলা গেল, কিন্তু তাহলেই বা পালাবে কি করে শুনি?"

দেবাশীষ বলে, "দেয়ালের উপর দিকে তাকিয়ে দেখেছো? আলো-বাতাস আসবে বলে মাথার দিকে খানিকটা ফাঁক—সে ফাঁকে তারের জাল। ওটা খুলতে পারলে ঐ তার দেয়ালে লাগিয়ে আমি অনায়াসে উঠতে পারবো, তারপর তার ছিঁড়ে ফেলা শক্ত হবে না। ওদিক থেকে পাখীর ডাক শুনে বুঝছি, ওদিকে বাগান আর বাগানের গায়েই জানি, গঙ্গা। তুমি আর আমি অনায়াসে চলে যেতে পারবো---তারপর পুলিশ এনে ব্যাটাদের সগোষ্ঠী একেবারে···বুঝেছো?"

দেবাশীষ তক্তা বেয়ে উপরে উঠতে পারবে, তাতে সুদর্শনের সন্দেহ

নেই। রীতিমত স্পোর্টস্‌ম্যান—অনেক কিছু ও পারে। কিন্তু সুদর্শন? কোনো দিন এক্সারসাইজ করেনি! তাই সে ভয়ে উপর দিকে তাকায়।

আবার চলে তক্তার উপর আঘাত। মনে হয়, তক্তা নড়ে—বেশ নড়ে।

টানাটানি করতে করতে তক্তা খুলে যায়। ততক্ষণে হাঁফিয়ে উঠেছে এ ধারে সুদর্শন, ওধারে দেবাশীষ।

দম নিয়ে দেবাশীষ বলে, "তক্তাটা এখন যেমন লাগানো আছে, আলগাভাবে তেমনই লাগানো থাক। খাবার আসবার সময় হয়ে এলো। লোকটা খাবার নিয়ে এলে খেয়ে-দেয়ে গায়ে জোর করে তারপর তক্তা সরাবো। এখন সারা দিনের মত নিশ্চিন্ত—খাবার আবার আসবে সেই রাত আটটা নটায়। সন্ধ্যা হলেই আমরা সরে পড়বো, বুঝেছো? তুমি তৈরী থেকো।"

সুদর্শন বলে, "তৈরী সব সময়ে আছি। এ নরক থেকে বেরুতে পারলে বাঁচি।"

তেরো

সন্ধ্যা আসন্ন। ঘুলঘুলি-পথে পাখীর কাকলী শোনা যায়! সারাদিন পরে তারা বাসায় ফিরেছে।

দেবাশীষ আর সুদর্শন তক্তাখানিকে সরিয়েছে—সেখানিকে বাঁকাভাবে ঘুলঘুলির নীচে রেখেছে। নীচের দিকটা একজন চেপে ধরে থাকলে আর একজন অনায়াসে সে তক্তা বেয়ে উপরে উঠতে

পারে। ওদিকে কেউ আছে কি না, কে জানে! তাই ঠিক হলো, সুদর্শন এদিকে তক্তাখানা চেপে ধরে থাকবে এবং দেবাশীষ তক্তা বেয়ে উপরে উঠবে।

হলো তাই। উপরে গিয়ে দেবাশীষ শক্ত করে ঘুলঘুলির তার চেপে ধরে।

কিন্তু মুস্কিল মোটা তারের জাল ছেঁড়া! কোনো একটা অস্ত্র··· অন্ততঃ ছুরি থাকলেও ছিঁড়ে ফেলা যেতো। শুধু হাতে প্রাণপণ চেষ্টা। সে চেষ্টার ফলে তার একখানা হাত রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। হাতে তারগুলো বিঁধছে।

তবু আশা ছাড়ে না দেবাশীষ। সাপের বিষের ইন্‌জেকশনে মরার চেয়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে বেঁচে থাকতেই সে চায়! এ-চেষ্টায় যদি মরতে হয়—খুশী-মনেই সে মৃত্যু-বরণ করবে। আর ঘণ্টা-খানেক মাত্র সময়, খাবার আসবে—তার আগে কিছু করতেই হবে!

প্রাণপণ চেষ্টা···তারের জাল যদি একটুও ছিঁড়তে পারা যায়! তক্তাখানা আছে তেরচাভাবে—সে তক্তায় মানুষ কতক্ষণ থাকতে পারে? পা পিছলে যায়। দেবাশীষকে সেদিকেও হুঁশিয়ার থাকতে হয়।

বহুকালের পুরোনো জাল—বর্ষার বৃষ্টি, গ্রীষ্মের রোদ পেয়েছে কত! মরচে ধরেছে কত জায়গায়—টানাটানি ধস্তাধস্তির চোটে তারের একদিকটা শেষে ছিঁড়লো!

উৎসাহে বুক ভরে ওঠে! তারগুলোকে দেবাশীষ প্রাণপণে টানছে—টানছে···দুমড়োচ্ছে···টানছে···

মানুষের চেষ্টা···প্রাণপণ চেষ্টা কখনো নিষ্ফল হয় না।

দেবাশীষের চেষ্টা সার্থক হলো। তার খুললো।

মুক্তি···মুক্তি···মুক্তির পথ খোলশা।

হে ভগবান!

তক্তার উপর দাঁড়িয়ে ঘুলঘুলির ফোকরে মাথা বার করে দেবাশীষ ওদিকটা দেখে। ঘুলঘুলির নীচে অন্ধকার-বাগান—বাগানের গা বেয়ে উঁচু পাঁচিল—পাঁচিলের ওদিকে গঙ্গা। জীবন-প্রবাহিনী গঙ্গা!

পলকে দেখে নিয়ে দেবাশীষ নেমে পড়ে। তক্তাখানা চেপে ধরে সে—সুদর্শনকে উপরে উঠতে ইঙ্গিত জানায়।

সুদর্শনের গা কাঁপে! উঠতে গিয়ে দু-তিনবার তার পা পিছলে যায়। দেবাশীষ বলে, "ভয় নেই, পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে তক্তাটা দু' হাতে চেপে আস্তে আস্তে উঠে পড়ো। ঘুলঘুলির নীচে বাগান, পাশেই একটা মোটা ডাল দেখেছি, ওটা না থাকলে নামা যেতো না। হাত বার করে ওই ডালটাকে ধরে আস্তে আস্তে নীচে লাফিয়ে পড়ো দেখে শুনে। মনে হয়, নীচে ঘাস। পড়লে লাগবে না, শব্দও হবে না।"

আস্তে আস্তে সন্তর্পণে সুদর্শন ওঠে। ঘুলঘুলি নেহাৎ ছোট নয়, একজন মানুষ অনায়াসে গলে যেতে পারে। যেকালে এ বাড়ী তৈরী হয়েছিল, তখন মোটা তারের জাল দিয়ে বন্ধ করা হয়েছিল—কেউ এ জাল ছিঁড়বে, কোনদিন হয়তো কেউ তা ভাবতে পারেনি!

অনায়াসে গলে যায় সুদর্শন। দেবাশীষ বুঝতে পারলো গাছের ডাল সে নাগালে পেয়েছে। তারপর ধুপ করে একটা শব্দ। বোঝা গেল, সুদর্শন লাফিয়ে পড়েছে।

দেবাশীষ উঠলো, ঘুলঘুলির বাইরে হাত বাড়িয়ে মোটা গাছের ডালটা আঁকড়ে তারপর লাফিয়ে পড়ে।

অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। দেবাশীষ চুপি চুপি ডাকে, "সুদর্শন!"

সুদর্শন এগিয়ে এসে পাশে দাঁড়ায়। দেবাশীষ বলে, "চটপট পাঁচিলে উঠে পড়ো ওই গাছ বেয়ে। গঙ্গার দিকে গেলে হবে না, নৌকো পাবো না। জলে সাঁতরালে শব্দ হবে। এখনই জানতে পারবে, আমরা পালিয়েছি। কুকুরগুলো বাঁধা আছে। আমাদের পালানোর খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে কুকুর ছেড়ে দেবে। শীগগির উঠে পড়ো। পাশে বাড়ী থাক আর বাগানই থাক—নেমে উপায় করে নিতে পারবো।"

পাঁচিলের লাগাও একটা গাছ বেয়ে উঠে দুজনে ওধারে কোনো রকমে নামলো।

পতিত জমি—ওদিকে ক'টা আলো জ্বলছে। মনে হয়, দোকান। দ্রুতপায়ে দুজনে চললো ঐ আলো দেখে।

চৌদ্দ

সোমেন যখন হসপিটালে গেল, শান্তা তখন বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে।

সোমেনকে দেখে সে দু' হাত তুলে নমস্কার করলে, বললে, "শুনলুম, আপনি সকালেও এসেছিলেন। আমি বেহুঁশ পড়েছিলুম, আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি। সুস্থ হয়েছি। কাল সকালেই চলে যাবো। তাই

আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলুম। অনেক জরুরী কথা আছে। নীরেনবাবুও আসবেন, কথা আছে।"

সোমেন বললে, "বলুন, কি বলবেন?"

"এই যে সোমেনবাবুও এসেছেন শান্তা দেবী। তবে আর কি, ভালোই হলো। আমি এইমাত্র ওঁর বাড়ীতে ফোন করেছিলুম! কে বললে—মেডিকেল কলেজে গেছেন।"

বলতে বলতে নীরেন দত্ত কেবিনে ঢুকলেন।

সবিস্ময়ে সোমেন বললে, "আপনিও ঠিক জুটেছেন—বাঃ। আপনার দেখছি কিছুই অজানা থাকে না!"

দু' চোখ বিস্ফারিত করে নীরেন দত্ত বললেন, "বেশ কথা বলেছেন মশায়,—পুলিশের কাছে কোন্ খবরটা অজানা থাকে, বলতে পারেন? আপনার বন্ধু দেবাশীষবাবু আমাদের সঙ্গে শকুনের তুলনা করেন—পুলিশ আর শকুনের দৃষ্টি সমান। শকুন যত উপরে উঠুক, দৃষ্টি থাকে নীচে মরার সন্ধানে! পুলিশও তেমনই—যাই করুক, যেখানেই যাক—দৃষ্টি তার আসামীর দিকে। সেদিন অ্যালবার্ট হলে এক সাহিত্য-সভায় গেছি মশাই, চোখ এদিক-ওদিক ফেরাতে দেখি, অনেককালের দাগী অবিনাশকে! পুরো সাহিত্যিক সেজে ভোল একেবারে ফিরিয়ে ফেলেছে।"

বলতে বলতে তিনি হেসে ওঠেন, "পুলিশের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না, তা নয়। এই তো আমাদের অবিনাশ পুরো দশটি বছর গায়েব থেকে সাহিত্য-চর্চ্চা করেছে। তাকে অভিনন্দন দেওয়া হবে—কাগজে হৈ-হৈ ব্যাপার পড়ে গিয়েছিল। এ পর্য্যন্ত রঞ্জিত রায় বা অবিনাশ মিত্তিরকে কেউ চোখে দেখেনি, তাই! বলতে কি রঞ্জিত

রায়ের পরম-ভক্তরূপে আমিও তাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে গিয়েছিলুম। সেখানে মশায় দশ বছরের ফেরারী আসামী অবিনাশকে দেখে সত্যি আমার যা হলো!"

তিনি হাসতে লাগলেন।

তারপর বললেন, "তেমনই এই শান্তা দেবী। আমি যে ওঁকেই ফলো করছি! ওঁর চাল-চলন দেখে···সন্দেহ···তা উনি জানতেও পারেননি! কালই রাত্রের কথা—কলেজ স্ট্রীটে ওঁর বাসার সামনে একখানা মোটর দাঁড়াতে দেখি। তারপর দেখি, উনি এসে গাড়ীতে উঠলেন। তখনই আমার সন্দেহ হলো।"

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শান্তা বললে, "বুঝেছি। যেমন গাড়ীতে উঠেছি, আমার ঘর খালি পেয়ে—"

সগর্ব্বে নীরেন দত্ত বললেন. "নির্ভয় হোন শান্তা দেবী! নীরেন দত্ত কাঁচা ছেলে নয়, পুলিশে কাজ করে মাথার চুল পাকিয়ে ফেলেছি, অভিজ্ঞতাও বহুৎ লাভ হয়েছে। আপনাকে গাড়ীতে উঠতে দেখে আমার কি রকম সন্দেহ হলো, তখনই দু'জন কনষ্টেবলকে আপনার ঘরের পাহারায় রেখে থানায় ফোন করি। মোটরের নম্বর আমি নোট করে নিয়েছি। প্রত্যেকটি থানায় খবর দিলুম—এই নম্বরের মোটর দেখলে ধরবে। স্বপ্নেও ভাবিনি, অত রাত্রে আপনি অমনভাবে এসে মোটরে চড়বেন, আর আমি কাছে আসবার আগেই গাড়ীখানা হুশ করে বেরিয়ে যাবে!"

শান্তার মুখে মলিন হাসি। সে বললে, "তবে আর বলছি কি! আপনি আছেন, সোমেনবাবু আছেন, আমি সব কথা আপনাদের বলি শুনুন—তা হলে সব বুঝতে পারবেন।"

অত্যন্ত সংক্ষেপে সে যা বললো, সোমেন তার খানিকটা একদিন দেবাশীষের মুখে শুনেছে।

শুভ্রার বাবা তপেশ মিত্র ছিলেন প্রত্নতাত্ত্বিক। সুদর্শনের পিতা অবনী চৌধুরীর অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন তিনি। ধানবাদের এক জঙ্গলে তিনি এক অভ্রের খনির সন্ধান পান এবং সেখানকার একটি নক্‌শা তৈরি করে নিয়ে আসেন।

তাঁর পরামর্শে অবনী চৌধুরী বহু অর্থে সেই জঙ্গলে ক' বিঘা জায়গা কিনেছিলেন। এর পর দুজনের সেই খনি আবিষ্কারের কল্পনা জল্পনা চলতে থাকে।

অবনী চৌধুরীর ছোট ভাই মোহিনী চৌধুরী এ-সময়ে একেবারে নিঃসম্বল—ভাইয়ের কাছে ফিরে আসেন। সম্পত্তি নিয়ে এর আগে অনেক বিবাদ-বিসম্বাদ করলেও অবনী চৌধুরী ছোট ভাইকে ফেলতে পারলেন না—কাছে রাখলেন।

স্বপ্নেও তিনি ভাবেননি, তাঁর সেই ভাই এমন বিশ্বাসঘাতকতা করবে! তপেশ মিত্র যখন ধানবাদে যান, তাঁর সঙ্গে ছিলেন মোহিনী চৌধুরী। ক'দিন বাদে তিনি অবনী চৌধুরীকে তার করে জানান, ট্রেণ-এ্যাক্‌সিডেণ্টে তপেশ মিত্র আসানসোলে মারা গেছেন। ট্রেণ ছাড়বার সময় তিনি ট্রেণে উঠতে যান—পা শ্লিপ করে নীচে পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন!

এর পর ফিরে আসেন মোহিনী চৌধুরী।

অবনী চৌধুরীর ডান হাত হলো অচল। তিনি একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। বাপের শোচনীয় মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে শুভ্রা যখন বম্বে থেকে

দেশে ফেরবার জন্য রওনা হলো—এদিকে তখন অকস্মাৎ কলেরা হয়ে অবনী চৌধুরী মারা যান।

সে সময়ে আশুবাবু ব্যবসা-উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সুদর্শন তখন কলকাতায় পড়ছে। মরবার সময় অবনী চৌধুরী এই নক্সা আশুবাবুকে বিশ্বাস করে তাঁর হাতে দিয়ে যান এবং বলে যান, ভাইকে তিনি একরকম বিশ্বাস করতে পারেননি, কোনো কথাও তাই তাঁকে বলে যাননি।

এ পর্য্যন্ত সে নক্সা আশুবাবুর কাছেই ছিল। মোহিনী চৌধুরী এর পর কলকাতায় চলে আসেন এবং রঘুনাথ তেওয়ারীর শরণ নেন।

রঘুনাথ এই অভ্রের খনির সন্ধানে ছিল। শঙ্করলাল হলো রঘুনাথ তেওয়ারীর সম্বন্ধী। প্রথমে সে দীনভাবে আসে চাকরি করতে ভগ্নীপতির কাছে, কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধি—কাজেও পটুতা আছে—রঘুনাথকে সে হাতের মুঠোর মধ্যে এনে ফেললো। এক বৎসর ওখানে থেকে কাজ করতে গিয়ে শুভ্রা দেখেছে শঙ্করলালের ক্ষমতা অসম্ভব। তার পরামর্শ ছাড়া রঘুনাথ কোন কাজ করেন না।

শুভ্রা খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশলেও শঙ্করলাল তাকে বিশ্বাস করতে পারেনি।

রঘুনাথের যৌবনের বন্ধু চিরঞ্জীলালের কন্যা বলে পরিচয় দিয়ে শুভ্রা তাঁর কাছে এসেছিল। বেচারা চিরঞ্জীলালের কথা বলতে শুভ্রার চোখে জল আসে। লোকটা চিরদিনের দাগী—জগতে এমন দুষ্কার্য্য নেই যা সে করেনি। সত্য এবং খাঁটি ছিল সে শুধু তার মাতৃহীনা কন্যা শান্তার কাছে। শান্তা ছিল শুভ্রার বন্ধু—শুভ্রাকে সে ভালোবাসতো এবং শুভ্রাও তাকে নিজের বোনের মত দেখতো।

শান্তা যখন মারা গেল, চিরঞ্জীলাল তখন পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল। শুভ্রা তখন বৃদ্ধকে নিজের কাছে এনে তার দুঃখ ব্যথা লঘু করবার চেষ্টা করে। শেষ জীবনটা চিরঞ্জীলাল তার কাছেই কাটিয়ে গেছে—এবং সেই সময়েই সুদর্শন আর রঘুনাথ তেওয়ারী সংক্রান্ত সব ব্যাপার জেনে চিরঞ্জীলালের কাছ থেকে নিজেকে কন্যা শান্তা-পরিচয়ে রঘুনাথের নামে একখানা চিঠি লিখিয়ে নিয়েছিল।

এই পর্য্যন্ত বলে শুভ্রা চুপ করলো—সোমেন এবং নীরেন দত্ত নিঃশব্দে কাহিনী শুনছিলেন, কোন কথা জিজ্ঞাসা করেননি।

পনেরো

তারপর···

নীরেন দত্ত নিশ্বাস ফেলে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, "তারপর?" শুভ্রা বললে, "এর পর সে দেশে ফিরলো—ফিরে জানতে পারলো, সুদর্শনের সম্পত্তির প্রায় যায়-যায় অবস্থা। পিতার মৃত্যু, পিতৃবন্ধু অবনী চৌধুরীর মৃত্যু তাকে রীতিমত কাবু করেছিল। একদিন সত্যই সে গৃহত্যাগ করলো! কোথায় গেল, কেউ জানতে পারলো না!"

শান্তা পরিচয়ে শুভ্রা গেল রঘুনাথের কাছে। রঘুনাথ শান্তার মৃত্যু-সংবাদ পাননি, চিরঞ্জীলালের চিঠি পেয়ে তিনি বিনাবাক্যে শুভ্রাকে কাজে নিলেন।

বিশ্বাস করলো না শুধু শঙ্করলাল। শান্তাকে রীতিমত পাহারায় রাখার জন্য সে দু'জন দাসী রাখলো শুভ্রার কাছে।

এরই ফাঁকে শান্তা আলাপ করলে অক্ষয় আর মোক্ষদার সঙ্গে। রঘুনাথের যতটুকু পরিচয় জানে, গোপনে মোক্ষদা তাকে জানালো।

শুভ্রা সাবধান হলো। হুঁশিয়ার হয়ে এদের কাজ করতে লাগলো।

ম্যাকফার্শন কোম্পানির টাকা লুঠের সময় শুভ্রাই গাড়ী চালিয়েছিল —শঙ্করলালকে সে এমন বাগিয়ে নিলে যে শঙ্করলাল তাকে আর সন্দেহ করবার অবকাশ পেলো না।

এব পর মিললো সুযোগ।

শুভ্রা নিজের ইচ্ছামত সব জায়গায় সব ঘরে যাতায়াত করে—রঘুনাথের দলিল-পত্র কোথায় থাকে, তাও তার অজানা রইলো না। সুযোগ খুঁজছিল সে ঐ সব দলিল-পত্র হস্তগত করে সরবে বলে।

সে সুযোগ একদিন মিললো।

শঙ্করলাল গিয়েছিল বম্বে—সঙ্গে গিয়েছিলেন রঘুনাথ।

শুভ্রার উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। সে জানতো, শঙ্করলাল চিরঞ্জীলালের সন্ধান নেবেই। সে সন্ধান পেলে তার সত্য পরিচয়ও শঙ্করলালের কাছে প্রকাশ হবে।

সেইদিনই লিংচুর চোখ এড়িয়ে, দরোয়ান দাস-দাসীর চোখ এড়িয়ে রঘুনাথের খাশ কামরায় ঢুকে দেয়ালে গাঁথা আয়রণ-চেষ্ট খুলে শুভ্রা দলিল-পত্র যা ছিল, দেখে দেখে বেছে সংগ্রহ করেছিল এবং নিজের একটা আটাচি-কেসে সেগুলো নিয়ে রঘুনাথের বাড়ী থেকে বেরুলো।

শান্তার আসা-যাওয়ার উপর হস্তক্ষেপ করবার ক্ষমতা লিংচুরও ছিল না। ছোট ছোট চোখ মেলে সে শুধু তাকে দেখে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজিতে বলেছে, "কর্ত্তা বলে গেছেন, তিনি না-ফেরা পর্য্যন্ত কেউ যেন কোথাও না যায়!"

হেসে শান্তা বলেছিল, "আমি মাসীর বাড়ী যাচ্ছি—কর্ত্তার কাছ থেকে হুকুম নেওয়া আছে। কাল সকালে ফিরে আসবো—মাসীর খুব অসুখ—তাই দেখতে যাচ্ছি।"

কিন্তু ফিরলো না শান্তা। ফিরবে না ঠিক করেই বেরিয়েছিল।

কলেজ ষ্ট্রীটে তার এক বান্ধবীর বাড়ীতে ওঠে—সেখান থেকে দেবাশীষের ফোন নম্বর জেনে তাকে ফোন করেছে—সাড়া পায়নি। সোমেনকে মেডিকেল কলেজে এবং বাড়ীতে দু'জায়গায় ফোন করেছে—কোনো সাড়া পায়নি। তারপর কাল রাত্রে···তখন প্রায় এগারোটা—

তখনো শোয়নি শান্তা। একখানা বই পড়ছিল। খবর পেয়েছে, রঘুনাথ ফিরেছেন। ফিরেই তার খোঁজ করেছেন—তারপর নিশ্চয়··· সন্ধান নিচ্ছেন। লোহার সিন্দুকের! এবং সিন্দুক দেখে···

নীরেন দত্তকেও সে ফোন করবার উদ্যোগ করেছিল, কনেকশন পায়নি।

শুভ্রা ভাবছিল, রাত্রে বেরুতে পারবে না—তার সন্ধানে কত লোক লেগেছে এতক্ষণে! দেখলেই চিনবে। দলিল-পত্রগুলো কোনোরকমে দেবাশীষ বা নীরেন দত্তর হাতে দিতে পারলে সে নিশ্চিন্ত হতো!

জীবনে তার এতটুকু মোহ নেই!

সে জানে, দেবাশীষ তার বন্ধু সুদর্শনের ভার নেছে—সুদর্শনকে সে উদ্ধার করে আনবেই! সুদর্শন তার সম্পত্তি ফিরে পাক্—এই তার কামনা।

বাড়ীর সামনে এই রাত্রে মোটর থামলো না? হ্যাঁ! কে ঐ কড়া নাড়ে! ব্যগ্র কণ্ঠে জানায়, শুভ্রাকে এখনই দরকার—যদি এখনই একবার দেখা করেন!

বাড়ীতে লোকজন আছে, সাহস করে শুভ্রা বৈঠকখানায় এসে তার সঙ্গে দেখা করে।

সুদর্শন জখম হয়েছে। তাকে মেডিকেল কলেজে আনা হয়েছে। দেবাশীষ তাকে নিয়ে আসছিল—ঘণ্টাখানেক আগে বউবাজারের মোড়ে ভিড়ে মোটর থেমে গিয়েছিল, সেই ফাঁকে কে একজন গাড়ীর পা-দানীতে উঠেই সুদর্শনের বুকে ছোরা বসিয়ে তীরের বেগে পালিয়েছে! সুদর্শনকে দেবাশীষ মেডিকেল কলেজে এনেছে। শুভ্রার ফোনে বাড়ীর লোক তার আস্তানার নম্বর জানতে পেরে তাকে জানিয়েছে এবং সেইজন্যই দেবাশীষ শুভ্রাকে হসপিটালে যাবার জন্য নিজের গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে!

অস্থির হয়ে ওঠে শুভ্রা! কারো নিষেধ সে শুনলো না—যেমন ছিল, গাড়ীতে উঠে পড়লো।

মোটর ছুটল তীরের বেগে।

কিন্তু কোথায় মেডিকেল কলেজ—কোন্‌দিক দিয়ে তীরবেগে মোটর ছুটছে শুভ্রা জানে না! জানে, শুধু ওঠবায় পর কে তার গলা টিপে ধরলো—অন্ধকার মোটরের মধ্যে তাকে চেনা গেল না! শুধু একটা গর্জ্জন কানে এলো, "শয়তানী!"

এর পর কি, শুভ্রা জানে না! যখন জ্ঞান হলো, দেখে, মেডিকেল কলেজের এই কেবিনে রয়েছে।

নীরেন দত্ত বললেন, "হ্যাঁ, আমিই পুলিশের পাহারায় কেবিনে রেখেছি, জেনারেল বেডে রাখতে দিইনি। মোটরের নম্বর আমি নিয়ে তখনি আমি থানায় ফোন করেছিলুম। প্রত্যেক থানা থেকে গাড়ী আটক করবার চেষ্টা হয়েছিল—খুব সম্ভব, সেই কারণেই মোটর

বেশীদূর যেতে পারেনি—কলেজ স্কোয়ারে এক গলির মুখে শুভ্রাকে অজ্ঞান অবস্থায় নামিয়ে রেখে গাড়ীর নম্বর বদলে সরে পড়েছে। কলেজ স্কোয়ারের এ পথে লোক-চলাচল খুব কম। বাতিগুলো তেমন জোরালো নয়—ম্যাড়ম্যাড় করছে। এইজন্যই মোটরখানা পালাবার সুযোগ পেয়েছে।"

শুভ্রা বললে, "কিন্তু আমার কাগজপত্র?"

নীরেন দত্ত বললেন, "সব ঠিক আছে। থানায় আছে। আপনাকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি—এখন থানায় পুলিশের জিম্মায় থাকতে হবে। প্রমাণ আমি যা পেয়েছি, এখন পুলিশ নিয়ে গিয়ে অনায়াসে রঘুনাথ তেওয়ারী আর শঙ্করলালকে গ্রেফতার করতে পারবো—সার্চ্চ আর গ্রেফ্‌তার করার হুকুমও পেয়েছি। আমার গাড়ী বাইরে আছে—সোমেনবাবু যান মিস মিত্রকে নিয়ে। আমি বেলুড়ে যাচ্ছি। আমার পুলিশভ্যান এতক্ষণে রওনা হয়ে গেছে।"

মেডিকেল কলেজের কম্পাউণ্ডে নীরেন দত্তর মোটর দাঁড়িয়ে ছিল। শুভ্রাকে নিয়ে সোমেন বেরিয়ে এসে মোটরে উঠতে যাচ্ছে—প্রচণ্ড শব্দ! সঙ্গে সঙ্গে মোটরের সামনের খানিকটা চুরমার। ড্রাইভার আর্ত্তনাদ করে উঠলো—করে পরক্ষণেই চুপচাপ!

ছুটে এলেন নীরেন দত্ত। চারিদিক থেকে লোকজন ছুটে এলো

বোমা!

এই মোটর লক্ষ্য করেই কে বোমা ছুড়েছে।

ছুটোছুটি পড়ে গেল চারিদিকে।

স্তম্ভিত দাঁড়িয়ে সোমেন···শুভ্রা কাঁপছে। জখমী ড্রাইভারকে তখনই ষ্ট্রেচারে করে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হলো।

নীরেন দত্ত গম্ভীর মুখে বললেন, "লোকটা যেই হোক, ঠিক সময়ে ছুড়তে পারেনি! নিশ্চয় হুকুম ছিল, আপনারা গাড়ীতে উঠবেন—গাড়ী চলবে, তখন বোমা ছুড়বে! এ ভুলের জন্য মোটরখানা ভাঙ্গলো, ড্রাইভার জখম হলো—আপনারা খুব বেঁচে গেছেন! গুড্ লাক্! যাই হোক্, আপনারা অন্য ট্যাক্সিতে করে চলে যান, আপনাদের পৌঁছে দিয়ে ট্যাক্সি ফিরে এলে সেই ট্যাক্সিতে আমি বেরুবো।"

তাই হলো।

ষোলো

অসংখ্য পুলিশ-পাহারা ঘিরে ফেলেছে রঘুনাথ তেওয়ারীর বাড়ী।

দুজন সাব-ইনেসপেক্টর এবং আটজন সশস্ত্র কনষ্টেবল নিয়ে নীরেন দত্ত ভিতরে ঢুকলেন। দরোয়ান সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিলে, হল্‌দে-মুখ লিংচু অভিবাদন করে সরে দাঁড়ালো।

নীরেন দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, "তেওয়ারীজী আছেন?"

লিংচু জবাব দিলে, "নো। তিনি আজও বম্বে থেকে আসেননি।"

নীরেন দত্ত ভ্রূ-কুঞ্চিত করলেন। তিনি জানেন, রঘুনাথ তেওয়ারী ফিরেছেন। আজ তাঁকে কটন ষ্ট্রীটের অফিসে দেখা গেছে, অথচ লিংচু বলছে—তিনি ফেরেননি! কথাটা মিথ্যা, তাতে সন্দেহ নেই।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তাঁর ম্যানেজার শঙ্করলাল আছেন?"

লিংচু উত্তর দিলে, "আজ্ঞে, তিনি আজই এসেছেন, হুজুর! অফিস-রুমে বসে কাজ করছেন।"

বারান্দার এক পাশে ছোট একখানি ঘর সে দেখিয়ে দিলে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। বাগানে ঘরে আলো জ্বলছে। ছোট ঘরটিতেও জোর-আলো! দরজার পরদা সরিয়ে নীরেন দত্ত দেখলেন, দরজার দিকে পিছন করে চেয়ারে বসে টেবিলের উপর রাশীকৃত কাগজ-পত্র ছড়িয়ে শঙ্করলাল নিবিষ্ট মনে কি হিসাব কষছে।

ঘরখানি খুব ছোট, তার উপর সারা ঘরখানা জুড়ে মস্ত টেবিল··· টেবিলের পাশে ক'খানা চেয়ার।

নীরেন দত্ত দরজা থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আসতে পারি?"

ফিরে তাকালো শঙ্করলাল।

"কি সৌভাগ্য, মিষ্টার দত্ত! আসুন, আসুন।"

দু'হাত বাড়িয়ে সে নীরেন দত্তকে অভ্যর্থনা করে!

নীরেন দত্ত ঘরে ঢুকলেন···সঙ্গে সাব-ইনসপেক্টর দুজনও ঢুকলেন, কনেষ্টবলরা দরজায় দাঁড়িয়ে রইলো।

মৃদু হেসে শঙ্করলাল বললে, "আপনি যখন এসেছেন, আপনার উদ্দেশ্যও বুঝেছি। আপনি আমায় গ্রেফ্‌তার করতে এসেছেন—শুধু আমাকে নয়, তেওয়ারী-জীকেও!"

শুনে নীরেন দত্ত বিস্মিত হলেন—ওর হাসি-মুখ দেখে অবাক! শঙ্করলাল জানে, তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ বহু প্রমাণ পেয়েছে—অথচ এমন বেপরোয়া!

শঙ্করলাল সবিনয়ে বললে, "আপনারা বসুন, বাড়ী তো ঘিরে ফেলেছেন···তা ছাড়া পালাবার মতলব আমার নেই! থাকলে কাল রাত্রে যখন জেনেছি, সুদর্শনকে নিয়ে আপনাদেরই টিকটিকি দেবাশীষ পালিয়েছে, তখনই সরে পড়তে পারতুম!"

সুদর্শনকে নিয়ে দেবাশীষ কাল রাত্রে পালিয়েছে, খবরটা নীরেন এই প্রথম শুনলেন···শুনে আশ্চর্য্য হলেন! কাল রাত্রে দেবাশীষ বেরিয়ে এসেছে—আজ তাঁকে খবরটা দেওয়া উচিত ছিল।

শঙ্করলাল সাদরে তিনজনকে তিনখানি চেয়ারে বসিয়ে নিজে অন্যদিকে একখানি চেয়ারে বসলো। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, "কিন্তু কি চার্জ্জে গ্রেফতার হচ্ছি, জানতে পারি, মিষ্টার দত্ত?"

নীরেন দত্ত বললেন, "আইন আছে, জানেন নিশ্চয় কগ্‌নিজেবল কেস্ কেউ যদি করে এবং সে সম্বন্ধে অপরাধী বলে পুলিশের সন্দেহের কারণ থাকে, ক্রিমিনাল প্রোসিডিয়োর কোডের সেক্সন ফিফ্‌টি-ফোর-এ —পুলিশ তাকে গ্রেফ্‌তার করতে পারে।"

শঙ্করলালের ভ্রূকুঞ্চিত হলো। শঙ্করলাল বললে, "কিন্তু সে কগ্‌নিজেবল্ কেসটি কি, তা জানবার অধিকার আমার আছে নিশ্চয়?"

দাঁতে দাঁত চেপে নীরেন দত্ত উচ্ছ্বসিত ক্রোধ কোনো রকমে দমন করলেন, করে বললেন, "আপনাদের বিরুদ্ধে বহু প্রমাণ পেয়েছি। নানা চার্জ্জ। প্রথম, কোকেন আমদানী এবং তা বিক্রী! ওই চীনা-ম্যানটার সাহায্যে এ কাজ আপনারা করেন। এ বাড়ীতে আপনার কোকেন থাকে না—থাকে এ্যালুমিনিয়ামের কারখানায়—বেনামে সে কারবার চালাচ্ছেন আপনারা।"

শঙ্করলাল হাসে, বলে, "তারপর?"

নীরেন দত্ত বলেন, "খুন। আশুবাবুকে তেওয়ারীর কথায় তুমি খুন করেছো। সাপের বিষ দিয়ে ইন্‌জেকশন···তাঁদের শ্যামবাজারের বাড়ীতে গিয়েছিলে, আশুবাবু তখন নিজের ঘরে। পাইপ বেয়ে উঠে জানলা গলে ঘরে ঢুকে তুমি তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় খুন করেছো!"

স্থির কণ্ঠে শঙ্করলাল বললে, "চমৎকার! অবশ্য যথেষ্ট মাথা ঘামিয়েছেন এ গল্প বানাতে! কিন্তু একটা কথা, আশুবাবুকে খুন করবার উদ্দেশ্য?"

নীরেন দত্ত বললেন, "উদ্দেশ্য, অভ্রের খনির নক্সা হস্তগত করা—যেখানা অবনী চৌধুরী আশুবাবুর হাতে দিয়ে যান। আমি বিশেষ পরীক্ষা করে জেনেছি, একমাত্র তুমি ছাড়া আর কেউ সে রাত্রে আশুবাবুর ড্রয়ার বা আয়রণ চেষ্ট খোলেনি! তোমার আঙুলের ছাপ আমরা পেয়েছি! আমরা মিলিয়ে দেখেছি, সে ছাপ বম্বের বিখ্যাত দস্যু কিষেণচাঁদের আঙুলের ছাপের সঙ্গে মিলে গেছে।"

হো হো করে হেসে শঙ্করলাল বলে, "ধান ভানতে শিবের গীত! হচ্ছে আমার কথা, তাতে এলো কিষেণচাঁদ! সে থাকে বম্বেতে। কোথায় কলকাতা, আর কোথায় বম্বে! আপনার মাথার ঠিক নেই—মিষ্টার দত্ত।···কাজ করতে পারছেন না—আসামী পাকড়াতে পারছেন না—উপরওয়ালার কাছে তাড়া খাচ্ছেন, তাই এখন যা-তা গল্প বানিয়ে আমার উপর জুলুমবাজি! এর পর আবার বলবেন, আমি ভোর বেলা আবার আশুবাবুর বাড়ী গিয়েছিলুম—তাড়াতাড়িতে আসল জিনিষ ঐ নক্সাখানা ঘরের মেঝেয় ফেলে এসেছিলুম! তাই না?···না, না, পকেটে হাত দেবো না! গুলি-ভরা রিভলভার আপনাদের প্রত্যেকের কাছে আছে, আমি জানি। আমি পালাবার চেষ্টা করলেই আপনারা গুলি করবেন, তাও আমার অজানা নয়।"

একটু থেমে সে আবার বললে, "আমি জানি, এখানে আপনারা সশস্ত্র তিনজন পুলিশ অফিসার, দরজায় আটজন সশস্ত্র কনষ্টেবল, তাছাড়া সারা বাড়ী ঘিরে আছে দুশো না হোক, অন্ততপক্ষে দেড়শো

কনষ্টেবলের কম নয়! এ অবস্থায় আমার পালাবার মতলব···কিন্তু এ কি কাণ্ড!"

বাড়ীর সব আলো একসঙ্গে দপ করে নিভে গেল। কে বোধ হয় মেন-সুইচ অফ্ করে দিয়েছে! মুহূর্ত্তে বিপর্য্যয়!

দপ করে নীরেন দত্তর হাতে টর্চ্চ জ্বলে ওঠে—সেই সঙ্গে ভীষণ শব্দ শোনা যায় এবং ঘরের মধ্যে তিনজন অফিসারকে কে যেন চেয়ারসুদ্ধ উপরদিকে ছুড়ে দিলে!

সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই প্রচণ্ড শব্দ—বারুদের গন্ধে চারিদিক ভরে ওঠে।

বাইরের পুলিশ-বাহিনী ছুটে ভিতরে আসে,—মিনিট দশেক পরে সারা বাড়ী বাগান আবার আলোয় আলো।

সে আলোয় দেখা গেল,—ঘরের সামনে যে আটজন কনষ্টেবল ছিল, তাদের মধে, পাঁচজন মারা গেছে, তিনজন অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

ঘরের অবস্থা সাংঘাতিক—চেয়ার টেবল উল্‌টে পড়ে আছে! মনে হয়, ঘরের মধ্যে যেন ভীষণ ঝড় বয়ে গেছে! তিনজন অফিসারের একজন ঘরে নেই! এদিক-ওদিক সন্ধান করে তাঁদের পাত্তা পাওয়া গেল না।

বাইরের বাহিনী নিয়ে সাব-ইন্‌স্‌পেক্টর অনর্থক চারিদিক ঘুরতে লাগলেন।

গঙ্গার দিকে দরজা খোলা—জলের উপর মোটর-বোটের শব্দ শোনা যায়—সোঁ-সোঁ করে জল কেটে চলেছে।

নৌকো! একখানা নৌকো!

কোথায় নৌকো? টর্চ্চের আলোয় কোথাও কিছু দেখা যায় না!

সতেরো

বহু দূরে জলের বুকে ভিক্টোরিয়া ষ্টীমার!

মনে হয়, এখনই ছাড়বে—মাঝি-মাল্লারা প্রস্তুত হয়ে আছে।

একখানা মোটর বোট এসে ভিক্টোরিয়ার পিছন দিকে থামলো—তারপর নিঃশব্দে ভিক্টোরিয়ার গায়ে এসে লাগলো। বোট থেকে শঙ্করলাল ষ্টীমারের ডেকে লাফিয়ে পড়লো।

ষ্টীমারের ক'জন মাল্লা সসম্ভ্রমে এগিয়ে এলো—শঙ্করলালের হুকুমে তারা বোটে নেমে গেল, এবং একে একে তিনজন অচেতন মানুষকে বয়ে ষ্টীমারে তুললো।

কপালের ঘাম মুছে শঙ্করলাল বললে, "পিছনে কেবিনে রাখো। কজন ওখানে পাহারায় থাকবে, জ্ঞান হবার লক্ষণ দেখলে আমাকে খবর দেবে।"

তাদের নিয়ে যাবার আগে সে নিজে তল্লাস নিয়ে রিভলভার আর ছোরা ক'খানা হস্তগত করলে। তারপর আক্রোশভরে বললে, "হতভাগা! শঙ্করলালকে চিনিসনা, তাই তার কাছে এসেছিলি বাহাদুরী করতে। শঙ্করলালকে ধরা সহজ নয়, হাড়ে হাড়ে তা বুঝিয়ে দেবো।"

লোক তিনজনকে খালাশীরা নিয়ে গেল।

"লিংচু—"শঙ্করলাল ডাকলো।

লিংচু সেলাম করে সামনে এসে দাঁড়ালো!

তার পিঠ চাপড়ে শঙ্করলাল বললে, "আজ তোমার বুদ্ধির জোরে খুব বেঁচে গেছি! এর জন্য রীতিমত বখশিস মিলবে।"

লিংচু দাঁত বার করে আবার সেলাম জানায়।

শঙ্করলাল দোতলায় উঠে যায়।

সজ্জিত কেবিনে ছিলেন রঘুনাথ তেওয়ারী। মুখ উদ্বেগে কাতর মলিন। শঙ্করলালকে দেখে তিনি যেন প্রাণ পেলেন, বললেন, "এই যে···এসেছো! আঃ! তোমার জন্য এমন অশান্তি ভোগ করছিলুম। জিদ করে তুমি বেলুড়ে গেলে, আমার মানা শুনলে না! আমি সেই থেকে যে অশান্তিতে আছি!"

শঙ্করলাল বললে, "শঙ্করলালকে ধরবে এমন পুলিশ আজও এ মুল্লুকে জন্মায়নি তেওয়ারীজি,—কিষেণচাঁদকে আপনি চেনেন—তার কাজের পরিচয়ও আপনি পেয়েছেন, কাজেই আপনার ভয়ের মানে হয় না।"

হাসতে হাসতে সে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। দু-হাত টেবলে ছড়িয়ে দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রঘুনাথের মুখের উপর রেখে বললে, "আগে আপনার এ রকম ভয় ছিল না তেওয়ারীজি, আজকাল যত বয়স হচ্ছে, আপনার ভয় তত বাড়ছে, দেখছি।"

রঘুনাথ বলেন, "না, ভয় ঠিক নয়! তবে—"

শঙ্করলালের দু'চোখে আগুন জ্বলে ওঠে! সে বললে, "শুনুন তেওয়ারীজি, আপনি জানেন—আপনি ছিলেন পেটি ব্যাপারী ফিরিওয়ালার মত, লাখ টাকার স্বপ্ন দেখেছেন শুধু—লাখ টাকা জমাতে কোনো দিন পারতেন না। আজ লাখ টাকা নয়, কোটি টাকার মালিক আপনি। এ সব আমার দৌলতে—এ কথা আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না, নিশ্চয়!"

শুষ্ক কণ্ঠে রঘুনাথ বলেন, "না"।

শঙ্করলাল বললে, "বম্বের কিষেণচাঁদ আপনার সম্বন্ধী-পরিচয়ে শঙ্করলাল নাম নিয়ে আপনার ফার্ম্মে আসা ইস্তক আপনার কারবার একদিক দিয়ে নয়, বহুদিক দিয়ে ফেঁপে উঠেছে। আপনি আজ মানুষ যা চায়—অর্থ, সম্মান, খ্যাতি···সব পেয়েছেন!"

বাধা দিয়ে রঘুনাথ বললেন, 'হ্যাঁ, সবই পেয়েছি কিন্তু আরো কি পেয়েছি, ভাবো শঙ্করলাল! এখন প্রতিক্ষণ শুধু মনে হয়, কখন পুলিশ আসবে—জানতে পারবে আমি আসল রঘুনাথ নই—রঘুনাথ তেওয়ারীকে সরিয়ে দিয়ে আমি মোহিনী চৌধুরী···আজ রঘুনাথ তেওয়ারী হয়ে বেড়াচ্ছি! তোমার কথায় শুভ্রার বাবাকে চলন্ত ট্রেণ থেকে ঘুমন্ত অবস্থায় বাইরে ফেলে দিয়ে আমি খুন করেছি, নিজের সহোদর ভাইকে খুন করেছি, ভাইপোকে সর্ব্বস্বান্ত করেছি। বলতে পারো শঙ্করলাল,—আমাকে খেলিয়ে তোমার কি লাভ হচ্ছে? কি লাভ হবে?"

হো হো করে হেসে উঠে শঙ্করলাল বলে, "বাঙ্গালীর মাথা কিনা—অনেক কিছু কল্পনা করে। তোমায় নিয়ে আমি খেলাচ্ছি না, তেওয়ারীজি, তোমায় আমি রাজা করে দিয়েছি! আরও কি তুমি চাও! তোমায় মুক্তি দিতে পারতুম—যদি তোমার আত্মীয়া শুভ্রার সঙ্গে আমার—"

"চুপ, চুপ, ও কথা মুখে এনো না শঙ্করলাল!" সরোষে মোহিনী চৌধুরী টেবলে মুষ্ট্যাঘাত করলেন, বললেন, "অমন মেয়ে—জেনে শুনে জল্লাদের হাতে দেবো? দুনিয়াদারী পেলেও আমি তা পারবো না। কি ভাবে কোথায় না তুমি তার পাছু নিয়েছিলে? তুমি যেমন তাকে সন্দেহ করেছিলে, সেও তেমনি তোমায় চিনে দূরে সরে ছিল। আমি

তাকে অনেক আগে না হোক—দু-চার দিন হলো চিনেছি, জেনেছি! বম্বেতে থাকলেও সে আমার ভাগ্নী—তার বাপকে যে খুন করেছে, সেই খুনীকে ধরিয়ে দেওয়া তার পণ।"

শঙ্করলাল গর্জ্জে ওঠে, "তাকে চিনেও সে কথা আমায় বলেননি? আপনি বিশ্বাস রাখতে পারেননি! বেইমানী করেছেন! বেইমানীর সাজা জানেন?"

ম্লান হাসি হাসলেন মোহিনী চৌধুরী। বললেন, "জানি, জান নেবে তো!"

শঙ্করলাল বললে, "কিন্তু না, আপনার জান আমি একদমে নেবো না—আপনাকে আমি তিলে তিলে মারবো।"

মোহিনী চৌধুরী তবু হাসেন! তিনি বলেন, "তা তুমি পারো—আমারো তাতে আপত্তি নেই, শঙ্করলাল।"

সরোষে শঙ্করলাল বলে, "এই জন্যই বাঙ্গালী জাতটাকে আমি দেখতে পারি না চৌধুরী! আসলে এরা বিশ্বাস রাখতে জানে না। আমি তোমায় রাজা করেছিলুম। তোমায় কি না দিয়েছি—যশ মান ধন ঐশ্বর্য্য—"

মোহিনী চৌধুরী হাত তোলেন, বলেন, "থাক, আমাকে রাজা করার মূলে তোমার যে উদ্দেশ্য ছিল, তা আমার জানতে বাকি নেই। বম্বের নামজাদা ডাকাত তুমি—তেওয়ারীর সম্বন্ধী সেজে আজ তিন-চার বছর বাঙ্গলায় কাটিয়ে পরখ করলে, কেউ তোমার ছদ্মবেশ ধরতে পেরেছে কি না! ভেবেছিলে, কেউ যখন ধরতে পারলো না, তখন একদিন রঘুনাথ তেওয়ারীকে যেমন ভাবে সাবাড় করে মোহিনী চৌধুরীকে রঘুনাথ বলে খাড়া করেছো, সেই ভাবে তাকেও বিদায় দিয়ে তার সম্বন্ধী শঙ্করলাল সব

কিছু দখল করে বসবে! এই মতলবই তোমার ছিল শঙ্করলাল। এর পর যখন দেখলে ধরা পড়ে গেছ, রঘুনাথের কীর্ত্তি সকলে জেনেছে, তখন অনেক-কিছু ফেলে রেখে অনেক কিছু নিয়ে এখন চলেছ বিদেশে—আমেরিকায় না হয় ইউরোপে—অর্থাৎ সেখানে তুমি হবে রাজা আর আমি তোমার গোলাম—তাই না?"

হা হা হা—

শঙ্করলাল হেসে ওঠে, "ঠিক ধরেছো বাঙালী! কুত্তার মত সেখানে তোমায় আমার পায়ের নীচে থাকতে হবে। হ্যাঁ, তোমার কথাই ঠিক। যাক, এই কেবিনে তুমি থাকবে—যতদিন না আমি ঠিক জায়গায় পৌঁছুই। কেবিন থেকে তুমি এক-পা বেরুবে না হুঁশিয়ার!"

উঠে দাঁড়ায় সে—তারপর মোহিনী চৌধুরীর সামনে দিয়েই বেরিয়ে যায়। মোহিনী চৌধুরী হতভম্ব!

লিংচু দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, সে ত্রস্ত হস্তে কেবিনের একটি মাত্র দরজা বন্ধ করে দিলে।

আঠারো

"দত্ত, মিষ্টার দত্ত—ইন্‌স্‌পেক্টর দত্ত।"

দ্বারে ঘা দিয়ে শঙ্করলাল ডাকে।

ধড়মড় করে উঠে বসেন নীরেন দত্ত···বিস্মিত নেত্রে শঙ্করলালের পানে তাকান। ঘৃণায় মুখ বিকৃত হয়ে ওঠে! তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন

স্মিত হাস্যে শঙ্করলালের মুখ উদ্ভাসিত। "তারপর মিষ্টার দত্ত, কেমন আছেন, জানতে এসেছি।"

গর্জ্জন করেন নীরেন দত্ত, "আমি তোমার উপহাসের পাত্র নই, কিষেণচাঁদ। বন্দী করে রেখে মানুষকে খুঁচিয়ে মারা ভীতুর কাজ, কুত্তার কাজ।"

ব্যঙ্গের সুরে শঙ্করলাল বা কিষেণচাঁদ বললে, "তাই না কি? কিন্তু আজ আমার আনন্দ করবার দিন। চাকা ঘুরে গেছে না হলে আপনারা আমার সঙ্গে ঠিক এই রকমই করতেন! নয়?"

নীরেন দত্ত কথা বলেন না—কথা বলতে তাঁর ঘৃণা হয়

আজ দুদিন তাঁর জ্ঞান হয়েছে। জ্ঞান হয়ে তিনি বুঝতে পারেন না, কোথায় আছেন। অনেকক্ষণ পরে বুঝলেন—ষ্টীমারে অন্ধকার কামরার মধ্যে একা পড়ে আছেন। মনে পড়ে, বেলুড়ে রঘুনাথের বাগান-বাড়ী···শঙ্করলালকে গ্রেফ্‌তার করতে গিয়েছিলেন।

এখন মনে হলো, বাড়ীতে এমন বড় বড় ঘর থাকতে শঙ্করলাল সে ছোট ঘরটিতে বসেছিল কেন! নিশ্চয় সে-ঘর এমন ভাবে তৈরী যে চকিতে বিপর্য্যয় ঘটানো চলে! শঙ্করলাল বুঝেছিল নীরেন দত্ত তাকে গ্রেফ্‌তার করতে আসছেন, বাড়ী ঘেরাও করবেন, তাই সে প্রস্তুত হয়েই ছিল!

নীরেন দত্ত ভ্রূ-কুঞ্চিত করলেন। ছি, এমন বোকার মত কাজ করেছেন তিনি! কেন তিনি সব দিক না ভেবে···

কিষেণচাঁদ সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করলে, "কি ভাবছেন, স্যর? নিজের অবস্থা?"

নীরেন দত্ত শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, "না। আমার সঙ্গে যে দু'জন ছিল, তাদের কথা ভাবছি! তারা কোথায়?"

কিষেণচাঁদ বললে, "তাদের জন্য ভাববেন না। তারা আপনার বোঝা বয়, কুলি বললেই চলে! ভারবাহী গর্দ্দভ। সেইজন্যই তারা ডেকে আছে স্বচ্ছন্দে···তারা শুধু পাহারাদারীতে আছে। তা ছাড়া সম্পূর্ণ মুক্ত। আপনি নিজের ভাবনা ভাবুন। আর ঘণ্টাখানেক বাদে আমাদের নামতে হবে ষ্টীমার থেকে, তারপর উঠবো প্লেনে। চমৎকার জায়গায় নিয়ে যাবো···দেখবেন, সেখান থেকে আর ফিরতে চাইবেন না। যাক্, তৈরী থাকুন, কথাটা জানিয়ে আপনাকে একবার দেখে গেলুম। আচ্ছা, নমস্কার!"

বিচিত্র হাসি হেসে সে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দরজা হলো বন্ধ।

কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, নিয়ে গিয়ে কি করবে, কিছুই বুঝতে পারেন না দত্ত। তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন।

ঘস ঘস ঘস···ষ্টীমারের গতিবেগ কমে আসে—তারপর মনে হয়, থেমেছে। বাইরে কার পায়ের শব্দ শোনা যায়।

দরজা খুলে লিংচু এসে সসম্ভ্রমে সেলাম করার ভঙ্গীতে দাঁড়ায়, বলে, "জনাব, এখানে আমাদের নামতে হবে। কিষেণজির হুকুম, আপনাকে খাতির করে নামিয়ে নিয়ে যেতে হবে।"

সে এগিয়ে আসে।

হাতে বাঁধন দেবার আগেই প্রৌঢ় নীরেন দত্ত অকস্মাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে তার গালে প্রচণ্ড ঘুষি মারেন। চতুর লিংচু ফশ্ করে নীচু হয়ে সে-আঘাত থেকে আত্মরক্ষা করে এবং সঙ্গে সঙ্গে নীরেন দত্তর কোমর জড়িয়ে তাঁকে সবলে চেপে ধরে।

এর পর হাতকড়া পরাতে অসুবিধা হয় না। হেসে অত্যন্ত বিনয়ের ভঙ্গীতে লিংচু বলে, "ইন্সপেক্টার সাহেব এ-পর্য্যন্ত বহু লোকের হাতে হাতকড়া পরিয়েছেন, কিন্তু হাতকড়া কি, নিজে জানেন না! এবার বোঝো সাহেব, হাতকড়া নেহাৎ নরম জিনিষ নয়, হাতে লাগে।"

এরপর কোমরে একটা শিকল পরায়; তারপর বলে, "নাও, শান্ত-শিষ্ট ছেলের মত এবার নেমে পড়ো।"

ষ্টীমার থেকে যে জায়গায় সকলে নামলো—সে জায়গা নীরেন দত্তর সম্পূর্ণ অপরিচিত হলেও জায়গাটা সুন্দরবনের একাংশ বলে বুঝলেন। ঘন জঙ্গল হলেও এ দিকটায় খানিকটা ফাঁকা মাঠ। সেখানে একখানা প্লেন দাঁড়িয়ে আছে। রঘুনাথ-রূপী মোহিনী চৌধুরী আর কিষেণচাঁদ তাদের বহু অর্থ-সম্পদ নিয়ে এই প্লেনে কোথায় চলেছে!

নীরেন দত্তর এ্যাসিষ্টাণ্ট দুজনকে এখানে ছেড়ে দেওয়া হবে ব্যবস্থা হয়েছে। প্লেনে যাবে কিষেণচাঁদ, মোহিনী চৌধুরী এবং নীরেন দত্ত।

ভারতের সঙ্গে সকল সম্পর্ক চুকিয়ে চলে যাচ্ছে। তাদের কথাবার্ত্তায় নীরেন দত্ত বুঝলেন, বিদেশী ব্যবসা-বাণিজ্য যা-কিছু সবই শঙ্করলাল বেনামীতে করে নিয়েছে। বুলাকিদাস নামে সে এ-সব জায়গায় পরিচিত। গত তিন চার বৎসরে সে প্লেনে করে নানা জায়গায় যাতায়াত করেছে এবং ব্যবসা বেশ পাকা-রকম চালু রেখেছে।

নীরেন দত্ত রাগে জ্বলছেন। নিজের উপর রাগ! গত ক-বৎসর ধরে এত বড় জালিয়াতির ব্যবসা চলেছে, আর এই জালিয়াতির কোনো খবর রাখেন না তিনি!

তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "আমাকে বন্দী করে নিয়ে যাবার কারণ বুঝতে পারছি না, কিষেণচাঁদ! গোলামি করার চেয়ে…"

কিষেণচাঁদ হেসে ওঠে, বলে, "মৃত্যু ভালো—এই কথা বলতে চাও তো? তাই হবে দত্ত—তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করবো। এখানে এই জনহীন বনে তোমাকে মারলে কেউ জানতে পারবে না! শেয়াল-শকুনে না হয় হায়েনায় তোমার দেহ টুকরো টুকরো করে ফেলবে! তোমার দেহের সদ্গতি হবে তাতে!"

নীরেন দত্ত মুখ ফেরান।

মৃত্যু-বরণ করতে তিনি রাজী। এ লোকটার গোলামি—প্রাণ থাকতে নয়!

উনিশ

বনের পাশে ফাঁকা মাঠে নীরেন দত্তকে দাঁড় করানো হয়েছে। ও পাশে এরোপ্লেনে জিনিষ-পত্র তোলা হয়ে গেছে, বাকী শুধু যাত্রীদের ওঠা।

উদ্যত রিভলভার হাতে দাঁড়ায় কিষেণচাঁদ, একটু দূরে দাঁড়ান মোহিনী চৌধুরী।

"শোনো মিষ্টার দত্ত···" কিষেণচাঁদ বলে, "তোমায় বন্দী করে অত-বড় একটা জীবন্ত প্রমাণ সঙ্গে নিয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরবো না—এ জানা কথা—অনর্থক ভয় না করে এ কথাটা ভেবে দেখলে বুদ্ধিমানের কাজ হতো! যাক্, তোমাকে বিদায় দেবার আগে সব কথা তোমায় জানিয়ে দিতে চাই ··শুনে বুঝবে কিষেণচাঁদ মানুষটার সামর্থ্য কতখানি! হ্যাঁ, আসল রঘুনাথ তেওয়ারী ইহলোকে নেই—মারা গেছে চার বছর আগে,

কিন্তু নিরেট তোমরা—কোনো সন্ধান পাওনি! সুদর্শনের কাকা মোহিনী চৌধুরীর নামে তোমরা ওয়ারেণ্ট বার করেছিলে, আর মোহিনী চৌধুরী যে রঘুনাথ তেওয়ারী হয়ে চার বছর তোমাদের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা তোমরা স্বপ্নেও ভাবোনি!"

মৃত্যু-পথযাত্রী নীরেন দত্ত একবার রঘুনাথ তেওয়ারী-রূপী মোহিনী চৌধুরীর পানে তাকান। এখন আর কিছু জানবার প্রবৃত্তি নেই তাঁর—বাধ্য হয়েই শুনতে হয়।

কিষেণচাঁদ বলে, "তবু তোমার উপর আমার রাগ বা বিদ্বেষ ছিল না। জানি, তুমি এক-নম্বর গঙ্গারাম, ভাগ্যগুণে পুলিশে বড় পোষ্ট পেয়েছো—আসলে তুমি একটা রাম-ঢ্যাঁড়োশ! নিজেকে যত বড়ই মনে করো না কেন—তুমি অতি নগণ্য, অতি তুচ্ছ। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী যদি কেউ থাকে তো-সে দেবাশীষ! হ্যাঁ, স্বীকার করি, তার ক্ষমতা আছে···সে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী! তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আরাম আছে—তোমার সঙ্গে নয়। মনে করলে আমি তাকে খুন করতে পারতুম। সে আমার হাতে এসেছে, তবু তাকে মারিনি! তার কারণ—"

"ধন্যবাদ! অশেষ ধন্যবাদ কিষেণচাঁদ—হাতে পেয়েও আমায় হত্যা করোনি!"

অকস্মাৎ পিছনের ঘন বনের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে দেবাশীষ, সঙ্গে সুদর্শন আর সোমেন, পাশ থেকে বেরিয়ে আসে আরো ক-জন সশস্ত্র কনষ্টেবল।

"হাত নামাও—হাত নামাও কিষেণচাঁদ—রিভলভার ফেলে দাও, বলছি।"

কিষেণচাঁদের উদ্যত রিভলভার নেমে পড়ে। সেটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে হেঁকে ওঠে কিষেণচাঁদ, "ঠিক সময়ে এসেছো বন্ধু—এইমাত্র আমি তোমার কথা বলছিলুম।"

পুলিশ ততক্ষণে চারিদিক ঘিরে ফেলেছে।

"দেবাশীষ!"

নীরেন দত্ত চীৎকার করে ওঠেন।

এগিয়ে আসে দেবাশীষ, বলে "হ্যাঁ, আমি এসেছি, নীরেনবাবু। আর একটু দেরী হলে আপনাকে পেতুম না, এই শয়তানগুলোকেও ধরতে পারতুম না। উঃ, কত ঘুরে যে পেয়েছি! ভগবান আছেন।"

গুড়ুম!

রিভলভারের শব্দে সকলে ফিরে তাকায়। রঘুনাথ তেওয়ারীরূপী মোহিনী চৌধুরী নিজের বুকে নিজে গুলি করেছেন!

মাটীতে পড়ে ছট্‌ফট্‌ করেছেন—দেবাশীষ ছুটে কাছে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সুদর্শন আর সোমেন।

বিস্ফারিত নেত্রে তিনি একবার সুদর্শনের পানে তাকিয়ে কি বলবার চেষ্টা করলেন, বলতে পারলেন না।

হতভাগ্য!

আর্দ্রকণ্ঠে দেবাশীষ বললে, "এই অভাগা লোকটির জন্য আমার বড় দুঃখ হয়, সুদর্শন! কত বড় ঘরের ছেলে,—কত সম্পত্তির মালিক ছিলেন একদিন! রেশ খেলে সব খুইয়ে শেষে গিয়ে পড়লেন এমন দলে, যারা ওঁকে হাতের পাশার মত নিয়ে খেলতে লাগলো! ভালো করে দেখ সুদর্শন—বহুকাল না দেখলেও চিনতে পারবে—রঘুনাথ নন, তোমার কাকা মোহিনী চৌধুরী।"

"কাকা!"

সুদর্শন ঝুঁকে পড়ে মৃতদেহের উপর।

দেবাশীষ বলে, "তোমার কাকার সঙ্গে রঘুনাথের চেহারার আশ্চর্য্য মিল ছিল—তফাৎ এই, তোমার কাকা বাঙ্গালী, আর রঘুনাথ তেওয়ারী বেহারী। আমাদের কিষেণচাঁদ ভালো মতলব করেছিল। রঘুনাথ তেওয়ারীর কাছে সে আগেকার বন্ধুত্বের সূত্রে এসেছিল, অনেক বিষয়ে তার অর্থাগমের সুযোগও করে দিয়েছিল, তবু যেমন ভাবে চেয়েছিল, তেমনটি পারেনি। তাই তেওয়ারীকে পথ থেকে দিলে সরিয়ে—আর তেওয়ারী-রূপে দাঁড় করালো বাঙ্গালী মোহিনী চৌধুরীকে। আশ্চর্য্য, তেওয়ারীর পার্ট মোহিনী চৌধুরী এমন নিখুঁৎ অভিনয় করে এসেছেন, এ পর্য্যন্ত কেউ ধরতে পারেনি!"

একটু থেমে সে আবার বললে, "বলবে, আমি কি করে জানলুম? জানলুম সোমেনের মামা আশুবাবুর কাগজ-পত্র দেখে। আশুবাবু জানতে পেরেছিলেন, ওরা রঘুনাথ তেওয়ারীকে খুন করেছে, আর বেলুড়ের বাগানের কোথায় লিংচু তার লাশ নিজের হাতে পুঁতেছে। মোহিনী চৌধুরীকে তিনি খুব ভালো ভাবেই চিনতেন—এবং চিনতেন বলেই পাছে সে-কথা প্রকাশ হয়ে যায়—এই জন্য কিষেণচাঁদ তাঁকে সাপের বিষের ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে খুন করে। আমি জানি ঠিক এই ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে রঘুনাথ তেওয়ারীকেও এরা খুন করেছিল

বুবুম—বুম!

বিরাট শব্দে একটা বোমা এসে পড়ে কনষ্টেবলদের মাঝখানে—মুহূর্ত্তে ছত্রাকার! ক'জন কনষ্টেবল ছিটকে, ক'জন সেইখানেই শুয়ে

পড়ে। সুদর্শনের পায়ে এক-টুকরো স্প্লিণ্টার এসে বিঁধলো—আর্ত্তনাদ করে সে পড়লো সেখানে।

ধোঁয়ায় চারিদিক অন্ধকার!

ধোঁয়া সাফ হবার আগেই প্লেনের ঘর্ঘর শব্দ কাণে আসে। দেবাশীষ নিশ্বাস বন্ধ করে ছুটে যায়—সঙ্গে সঙ্গে ছোটে সোমেন। কিষেণচাঁদকে নিয়ে প্লেন ততক্ষণে ঘর্ঘর শব্দে দুটো চক্র দিয়ে উঠে পড়েছে মাটী ছেড়ে।

"গুলি·····গুলি করো, সোমেন।"

কিন্তু প্লেন তখন নাগালের বাইরে—গুলি পৌঁছুবে না!

হতাশ ভাবে দেবাশীষ বলে, "ওঃ, এতদূর এসে ঘিরে ফেলেও কিষেণচাঁদকে ধরতে পারলুম না!"

ডাক্তার সোমেন ওদিকে আহতদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে।

কুড়ি

সুদর্শনের বিবাহ।

সকলেই নিমন্ত্রিত হয়েছে। সোমেন, দেবাশীষ, নীরেন দত্ত—কেউ বাদ নেই।

একটা ঘরে এই ঘটনার আলোচনা চলেছে।

দেবাশীষ বললে, "নব দম্পতী সুখী হোক্—আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ! শুভ্রার আশ্চর্য্য সাহস আর বুদ্ধি···এমন দেখা যায় না!

শুভ্রার জন্যই আজ এ আনন্দের সুযোগ মিলেছে। কি বলেন নীরেন বাবু? কিষেণচাঁদ যে রকম কাহিল করে তুলেছিল সকলকে…"

নীরেন দত্ত বললেন, "নেহাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম—তাই অস্ত্রশস্ত্রগুলো ওরা কেড়ে নিতে পেরেছিল! না হলে—"

বন্ধু শোভন সিং বললেন, "না হলে একচোট দেখে নিতেন! এ্যাঁ? কিন্তু, ওরা বন্দী করে অস্ত্রশস্ত্র আপনার কাছেই রাখবে, আপনার হাত খোলা রাখবে—তা কখনও হয়?"

নীরেন দত্ত লাল হয়ে ওঠেন, কোনো জবাব দেন না।

সোমেন বললে, "আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি—শুভ্রা এক বছরের উপর শঙ্করলালের ওখানে কাজ করেছেন, কি ভাবে নিজেকে রক্ষা করে চলেছিলেন, তাই ভাবি। শঙ্করলাল সব সময়ে ওঁর উপর নজর রাখতো। —শুভ্রা যেখানে যাবেন—তাঁকে ফলো করবে—কিন্তু শুভ্রা দেবীকে কখনো ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পায়নি! ওদের সঙ্গে থেকে ওদের সব কিছু জেনে ঐ সব দলিল-পত্র বাগিয়ে বার করে আনা—এ কি সহজ কাজ!"

দেবাশীষ বললে, "কি করে যে আমি এদের আসল পরিচয় উদ্ধার করেছি! বোম্বায়ের ডাকসাইটে ডাকাত কিষেণচাঁদ। ওর প্রকাণ্ড দল! বোম্বাই-পুলিশ বহু কষ্টে ওকে গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান দেয়—খুন, লুঠ, জালিয়াতি—নানা চার্জ। বিচারে ওর দ্বীপান্তরের হুকুম হয়। জাহাজে নিয়ে যাবার সময় কড়া পাহারার হাত ছিনিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ খেয়ে ও দেয় চম্পট। তারপর ওর কোনো পাত্তা মেলেনি আর!… বহুকাল পরে কলকাতায় শঙ্করলালের ভূমিকায় তার উদয়। রঘুনাথ তেওয়ারীর সঙ্গে আগে থেকেই ঘনীষ্ঠতা—নানা দিক দিয়ে শঙ্করলালের

কাছে সে ঋণী! কোকেনের ব্যবসায় লিংচু আর কিষেণচাঁদের সাহায্যে তেওয়ারী লাল হয়ে উঠেছিল! তাকে বিশেষ রকম ভয় দেখিয়ে এরা দুজনে বেনামে তার আশ্রয় নেয়। শেষ পর্য্যন্ত রঘুনাথ তাদের হাতে যেতে চায়নি বলেই খুন হয় এবং মোহিনী চৌধুরীকে তখন রঘুনাথ তেওয়ারী বলে ও গদীতে বসায়।"

সুদর্শনের মুখ মলিন! সে একটা নিশ্বাস ফেললো—"কাকাবাবু বেচারা রেশ খেলায় সর্ব্বস্বান্ত হয়ে এই কিষেণচাঁদের হাতে পুতুল বনে বাস করেছিলেন শেষে!"

দেবাশীষ বললে, "তাই! তোমার কাকা এক-আধ দিন নয়, চার-চার বছর রঘুনাথ তেওয়ারীর ভূমিকায় এমন চমৎকার অভিনয় করে গেছেন, কেউ ধরতে পারেনি। হ্যাঁ, একজন পেরেছিল—তিনি সোমেনের মামা আশুবাবু। মোহিনী চৌধুরীকে তিনি খুব চিনতেন, রঘুনাথের চেহারার সঙ্গে তাঁর চেহারার মিল ছিল—বাইরের কোনো মানুষ ধরতে না পারলেও আশুবাবু ধরতে পেরেছিলেন। ধরতে পেরে আশুবাবু স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন! সে সময় অর্থাৎ যেদিন আশুবাবু খুন হন —সেদিন সন্ধ্যায় পর মোহিনী চৌধুরী তাঁর কাছে যান, নানা লোভ দেখিয়ে অভ্রের খনির নক্‌শা চান—বলেন, তাঁর কথামত চললে তিনি আশুবাবুকে রাজা করে দেবেন! আশুবাবু রাজী হননি। তিনি বলেছিলেন, পুলিশে খবর দেবেন। এর পর কিষেণচাঁদের আবির্ভাব! আশুবাবু তখনও ঘুমোননি। কিষেণচাঁদের সঙ্গে নিশ্চয় ধস্তাধস্তি চলেছিল, সকালে ঘরের অবস্থা দেখে তাই মনে হয়েছিল। কিষেণচাঁদ ঐ ধস্তাধস্তির মধ্যে ইন্‌জেকশন চালায়, সঙ্গে সঙ্গে আশুবাবুর কাল-নিদ্রা! কিষেণচাঁদ কিছু কাগজ-পত্র হাতিয়ে নিয়ে যায়—সকালে

আবার আশুবাবুর বাড়ী আসে—তার কারণ, সব কাগজ হয়তো সে নিয়ে যেতে পারেনি, মেয়েদের বার করে দরজা বন্ধ করে দেয়—যে-পর্য্যন্ত পুলিশ না আসে—সে বাইরে অপেক্ষা করে থাকে। অর্থাৎ সে যে খারাপ মতলবে যায়নি, নীরেন বাবুর কাছে এইটুকু প্রমাণ করতে চেয়েছিল! কি বলেন নীরেন বাবু?"

নীরেন দত্ত কোনো জবাব দিলেন না—অন্যদিকে তাকালেন।

দেবাশীষ তারপর বলে, কি করে সুদর্শনকে সে মুক্ত করে। বেচারা অক্ষয় খুন হয়েছে। মোক্ষদারও সেই দশা! কলকাতায় ফিরে নীরেন দত্তর খোঁজ নিয়ে দেবাশীষ জানতে পারে—তিনিও কিষেণচাঁদের পরিচয় পেয়েছেন, এবং তাকে গ্রেফ্‌তার করতে গেছেন। দেবাশীষ তখনি সোমেন আর সুদর্শনকে নিয়ে বেলুড়ে রওনা হয়। শুভ্রা থাকে তার নৈহাটীর বাড়ীতে।

দেবাশীষ বলে, "বেলুড়ে এসে দেখি, বাড়ী ভোঁ-ভোঁ! চাকরদের মুখে শুনি, নীরেন দত্ত এসেছিলেন, তারপরই তারা একটা ভীষণ শব্দ শুনতে পায়। যে-সব কনষ্টেবল জখম আর খুন হয়েছিল, তাদের মধ্যে একজন সাব-ইন্‌সপেক্টর আর ক'জন কনষ্টেবলকে খুঁজে পাওয়া যায়নি! আরো জানলুম, রঘুনাথ তেওয়ারীর নিজের ষ্টীমার ভিক্টোরিয়াও অদৃশ্য হয়েছে। তখনই পুলিশে জানিয়ে সাহায্য চাই। তারপর একখানা লঞ্চ জোগাড় করে ভিক্টোরিয়া কোন্ পথে গেছে, সন্ধান নিয়ে তার পিছনে ছুটি। সুন্দরবনের এধারে এসে দূর থেকে ভিক্টোরিয়াকে দেখি নোঙ্গর-বাঁধা রয়েছে। আমিও সদলে খানিক দূরে লঞ্চ থেকে নেমে বনের ভিতর দিয়ে এগিয়ে আসি। তার পরের ব্যাপার নীরেন বাবু জানেন —কি বলেন?"

নীরেন দত্ত বোকার মত হাসলেন, বললেন, "আপনি না গিয়ে পড়লে ফায়ার হতো!"

দেবাশীষ বললে, "ভেবেছিলুম, কিষেণচাঁদকে গ্রেফ্‌তার করবোই। ওর ওই চীনে চাকরটা যে প্লেনের মধ্যে ছিল, তা জানতুম না। আশ্চর্য্য বুদ্ধি ঐ চীনেম্যানটার! অপমান আর লজ্জার দায় থেকে মুক্তি পেতে মোহিনী চৌধুরী আত্মহত্যা করলেন। আমরা একটু আনমনা ছিলুম, সেই সুযোগে লিংচু বোমা ফেলে চকিতের মধ্যে বিপর্য্যয় বাধালো! কিষেণচাঁদ গিয়ে প্লেনে উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গে প্লেনে ষ্টার্ট দেওয়া আমরা লক্ষ্য করিনি। যখন সচেতন হলুম, দেখি, প্লেন উড়ে গেছে! হাসির শব্দ কানে এলো! আপ্‌শোষ, বুদ্ধির যুদ্ধে কিষেণচাঁদের কাছে এমন হার হারলুম! তাকে ধরতে পারতুম! ওঃ, এমন সুযোগ··· পেয়ে হারালুম।"

দরজায় দাঁড়িয়ে সুদর্শনের মাতুল। কৃতাঞ্জলি-পুটে তিনি বলেন, "আপনারা দয়া করে ওবার গাত্রোত্থান করুন—পাতা হয়েছে।"

এরপর আর গল্প বলে না, সকলে উঠে পড়লো।

সোমেন হাসি-মুখে বললে, "মধুরেণ সমাপয়েৎ। শুভ্রা দেবীর জন্যই শুধু, সুদর্শন কেবল তার সব ফিরে পায়নি—আমিও পেয়েছি। মা এসেছেন—একছড়া নেকলেশ এনেছেন—শুভ্রা দেবীর বিবাহে উপহার। আর আমি এনেছি এই অতি দীন একখানি বাঁধানো খাতা। আর এসেছেন শুভ্রা দেবীর মাসতুতো বোন কৃষ্ণা দেবী···এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন শুভ্রা দেবীর মন্ত্রী আর সহায়, অবশ্য সকলের অন্তরালে! তার সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ পাবেন—তাঁর নাম কৃষ্ণা···তিনি এসেছেন

তাঁর মামার সঙ্গে···কৃষ্ণা দেবী বহু ক্রাইমের ব্যাপারে আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়েছেন, সে-পরিচয় পরে বলবো।"

শুভ্রা দেবী বললে—তার মুখে সরমের রক্তিম আভা—"আমার মনে যে ইচ্ছা আছে—এঁর যদি আপত্তি না থাকে, (সুদর্শনকে ইঙ্গিত করিয়া) তা হলে এ-ডায়েরির পাতায় এ-সব কথা লিখতে পারবো, আপনারা পড়তে পারবেন। সে ডায়েরি পড়ে মানুষের কিছু উপকারও হতে পারে! তা ছাড়া আর একটি প্রার্থনা আছে।"

দেবাশীষ বললে, "বলো!"

শুভ্রা দেবী বললে, "আমার বোন কৃষ্ণার সঙ্গে আলাপ করুন—এ-ব্যাপারে কৃষ্ণা আমাকে অনেক পরামর্শ দিয়েছে—ক্রিমিনলজিতে এই বয়সেই ওর বেশ জ্ঞান—তা ছাড়া ওর কি সাহস! এ-কাজে ওর সাহায্য না পেলে হয়তো আমার দ্বারা সব কাজ ঠিকঠাক হয়ে উঠতো না।"

এই কথা বলিয়া পর্দ্দার অন্তরাল হইতে হাস্যময়ী এক কিশোরীকে হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া শুভ্রা দেবী বলিল, "এই কৃষ্ণা···জানেন, কৃষ্ণা কি বলে? ও বলে, বিয়ে করবে না···শয়তানীর ব্যূহ ভেদ করে শয়তানদের ও বার করবে! ও করবে দুঃশাসনদের মুখোস খুলে তাদের স্বরূপ জানিয়ে তাদের খর্ব্ব করে, সমাজের কল্যাণ! সে-কাজে হবে কৃষ্ণার অভিযান!"

সমাপ্ত

ছেলেমেয়েদের কাছে লোভনীয় কয়েকখানি বই

● বিশ্বকথা সিরিজ ●

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধে জানতে হলে পড়তে হবে—

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের

সোভিয়েত দেশ ২·৫০
জাপান— দেব সাহিত্য কুটীর যন্ত্রস্থ
ফরাসী দেশ—
চীন দেশ—
জার্মান দেশ— ,, ,,

● শিকার ও অ্যাড্‌ভেঞ্চার ●

চন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতীর

সুন্দরবনের শিকারী ১·৫০

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শিকারের গল্প ২·০০

খগেন্দ্রনাথ মিত্রের

ঝিলে জঙ্গলে ১·৫০

সুধীন্দ্রনাথ রাহার

বাঘের দেশে ১·৫০

হীরেন্দ্রনাথ বসুর

বনে জঙ্গলে ৮·০০

● জীবজন্তুর কথা ●

সুবিনয় রায়ের

জীবজগতের আজব কথা ৬·০০

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্যের

সমুদ্রের রহস্য ৫·০০
পাতালপুরের দিগ্বিজয়ী ১·২৫

● বিশ্ববিজ্ঞান সিরিজ ●

পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক উন্নতি সম্পর্কে জানতে হলে পড়তে হবে—

প্রভাত গোস্বামীর

বিজ্ঞানের যুগান্তর যন্ত্রস্থ
বিজ্ঞান জগৎ

সুবোধচন্দ্র মজুমদারের

বিজ্ঞানের স্বপ্নপুরী যন্ত্রস্থ
বিজ্ঞানের মায়াজাল
জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা কথা··· ৫·০০

চন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতীর

দুনিয়ার আজব যন্ত্রস্থ

বিজন ভট্টাচার্য্যের

বিশ্বের বিস্ময় যন্ত্রস্থ

● ভূতের গল্প ●

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর

অদ্ভুত যত ভূতের গল্প ৬·০০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

ভূতুড়ে বই ১·৫০
অসম্ভব ১·০০

দেব সাহিত্য কুটীর সম্পাদিত

ভূত-পেত্নি-দত্যি-দানা ১২·০০

দেব সাহিত্য কুটীর—২১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯

অবসর সময়ে পড়বার মত কয়েকখানি ভাল বই

● হাসির গল্প ●

শিবরাম চক্রবর্ত্তীর

হাসির চোটে দম ফাটে — যন্ত্রস্থ
জন্মদিনের উপহার
যত হাসি ততই মজা
হাসির খোরাক
হিপ্ হিপ্ হুররে
হাসির ফোয়ারা
গল্প নাটক অল্প না
উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

জলতরঙ্গ — যন্ত্রস্থ

দেব সাহিত্য কুটীরের

হাসির এ্যাটম বোম — যন্ত্রস্থ

● ভ্রমণ কাহিনী ●

শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়ের

পথ চলে গল্প বলে — যন্ত্রস্থ

নলীগোপাল চক্রবর্ত্তীর

আকাশ গঙ্গা — ২·৫০

প্রভাস ঘোষের

দুর্গমের বিভীষিকা ··· ১·২৫

● ভূতের গল্প ●

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর

অদ্ভুত যত ভূতের গল্প — ৬·০০

বুদ্ধদেব বসুর

ভূতের মত অদ্ভুত — ৩·০০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

অসম্ভব — ১·০০
ভূতুড়ে বই — ১·৫০

সুনির্ম্মল বসুর

সব ভূতুড়ে — ১·৫০

দেব সাহিত্য কুটীরের

ভূত-পেত্নি-দত্যি-দানা — ১২·০০

● অ্যাড্‌ভেঞ্চার ও শিকার কাহিনী ●

সুন্দরবনের শিকারী (চন্দ্রকান্ত) — ১·৫০
শিকারের গল্প (আশু বন্দ্যোঃ) — ২·০০
বাঘের দেশে (সুধীন রাহা) — ১·৫০
ঝিলে জঙ্গলে (খগেন মিত্র) — ১·৫০
বনে জঙ্গলে (হীরেন বসু) — ৮·০০
মরণদূতের আনাগোনা (দৃষ্টিহীন) — ৪·০০
বটকালীর জঙ্গলে (ঐ) — ৪·০০

দেব সাহিত্য কুটীর—২১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯